হিন্দু সংহতি

স্বদেশ

সংহতি সংবাদ

সাহস ✪ শক্তি ✪ সক্রিয়তা

বিশেষ পূজা সংখ্যা ২০১৭ (আশ্বিন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক
সমীর গুহরায়

প্রকাশক ও মুদ্রক
তপন কুমার ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন ঃ ৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য-১৬ টাকা

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি
<www.hindusamhati.net>,
<hindusamhatibangla.com>
<www.hindusamhatitv.blogspot.in>,
Email : hindusamhati@gmail.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা		২
আহ্বান ও সাবধানবাণী ঃ স্বামী বিবেকানন্দ		৩
সাম্যদর্শীর সুসমাচার	দীপ্তরূপ সাম্যদর্শী	৪
বাঙালির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে	তপন ঘোষ	৬
ভুলে গেছি সেই বিপ্লবী যতীন দাস-কে	সংগৃহীত	৯
বাংলাদেশে ২০০১ সালে অক্টোবরের সেই রক্তাক্ত দিনগুলি	সালাম আজাদ	১২
একটি গ্রামের পাল্টে যাওয়া কাহিনী	শ্রী নিহারণ প্রহারণ	১৪
হিন্দু গণহত্যার ইতিহাস...	দিব্যেন্দু সাহা	২২
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইসলামের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি	অর্ণব সরকার	২৫
আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন?	রেজাউল মানিক	২৬
আমার কাশ্মীর	দেবশ্রী চক্রবর্তী	২৭
বঙ্গ কমিউনিস্ট	সমীর গুহরায়	৩৪
একাই একশ	ডাঃ অরুণকুমার গিরি	৩৫
-মা-এর মতো মা	সংগৃহীত	৩৯
পত্রিকা দপ্তর থেকে		৪২

কবিতা

দুর্গা এসেছে	অভ্যুদয় মজুমদার	৪০
হিন্দু সংহতি	সংগৃহীত	৪০
অবহেলিত হিন্দু	সংগৃহীত	৪০
জাগো হিন্দু জাগো	সুন্দরগোপাল দাস	৪১
চলে যাওয়ার পথে	অম্বিকা গুহরায়	৪১

আমাদের কথা

অকালবোধনের উদ্দেশ্য

অকাল বোধন। ত্রেতাযুগে অযোধ্যার রাজকুলের (রঘুবংশ) কুলতিলক রামচন্দ্র প্রথা ভেঙে দেবী দুর্গার আরাধনা করলেন। অকালে দেবী মা-র আবাহন, তাই আকাল বোধন। কিন্তু কেন তিনি অকালে দেবী দুর্গার পূজা করলেন? কারণ প্রবল, পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করতে 'শক্তিরূপিণী' মায়ের আশীর্বাদ একান্ত প্রয়োজন ছিল। যে শক্তির কাছে মহিষাসুর পরাভূত, যে শক্তির কাছে 'রক্তবীজ'-এর মতো শক্তিশালী অসুর পরাজিত; সেই শক্তিকে আশীর্বাদ রূপে ধারণ করতে চেয়েছিলেন রামচন্দ্র।

দুর্গাপূজা হল শক্তির আরাধনা, শান্তির নয়। শান্তির বার্তা নিয়ে রামচন্দ্র অঙ্গদকে রাবণের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কোন লাভ হয়নি। পরবর্তীকালে পাণ্ডবরাও শান্তির বাণী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কোন লাভ হয়নি। কারণ আসুরিক শক্তির কাছে তো 'শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' তাই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। যুদ্ধ ছিল শান্তির বার্তাবহ। স্বাভিমান রক্ষার্থে (সীতাদেবী ছিলেন রামচন্দ্র ও অযোধ্যার স্বাভিমান) রামচন্দ্র লঙ্কার মাটি রক্তে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু এতে তাঁর কঠিন হৃদয় (অথচ তিনি দয়ার অবতার রূপে চিহ্নিত) বিচলিত হল না। একইভাবে কুরুক্ষেত্রের মাটিও তাজা খুনে লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতেও অনুকম্পন সৃষ্টি হল না। আসলে আসুরিক শক্তি কেবল প্রবল শক্তির কাছেই মাথা নত করে। তাই যুদ্ধ ছিল অপরিহার্য।

সময় বদলেছে। অত্যাধুনিক যুগে নবরূপে আবির্ভূত কলিযুগের অসুর। আসুরিক শক্তি মাথা চারা দিয়ে উঠে বঙ্গদেশ (পশ্চিমবঙ্গ) গ্রাস করতে চাইছে। আর এই সঙ্কটকালে অকাল বোধন করে বাঙালী দেবী দুর্গার কাছে কী চাইছে? 'শান্তির ললিত বাণী।' হায় রে মূর্খ হিন্দু বাঙালী! অসুররা কি বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী-ও ছেড়ে দেবে, না দিয়েছে। তাই শান্তি না চেয়ে শক্তি চাওয়াই কি দেবী মা-র কাছে আমাদের একান্ত কাম্য নয়! আসুন, সকলে মিলে সেই শক্তির আরাধনা করি। অস্ত্রসাজে সজ্জিত দেবী দুর্গার কাছে অস্ত্র প্রার্থনা করি। আর সকলে সমবেতভাবে বলি-

যুদ্ধং দেহি যশং দেহি, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

আহ্বান ও সাবধানবাণী ঃ স্বামী বিবেকানন্দ

মুসলমানগণ যখন এইদেশে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের ঐতিহাসিক মতে এই ভারতবর্ষে ৬০ কোটী হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তিদোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তি দোষ আছে, কারণ, মুসলমানদিগের অত্যাচারেই অনেক প্রজা ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটীরও অধিক ছিল; কিছুতেই ন্যূন নয়। কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খ্রীষ্টানরাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটী লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। এই হিন্দু জাতি ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্যই করুণাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদের অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য আলোকের প্রভায় এই ভারতভূমি অধুনা কিঞ্চিৎ প্রতিভাত হইতেছে। ধীরে ধীরে এই সুপ্ত জাতির মধ্যে পাশ্চাত্য মহাজাতি সমূহের. অধিকার তারতম্য ভঞ্জনের বিরাট্ উদ্যম ও প্রাণপণ সংগ্রামের বার্তা অস্মদ্দেশীয় পরাহত প্রাণেও কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিতেছে। মানবসাধারণের অধিকার, আত্মার মহিমা নানা বিকৃত সুকৃত প্রণালীমধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ এ দেশের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে। নিরাকৃত জাতি সকল আপনাদের লুপ্ত অধিকার পুনর্ব্বার চাহিতেছে। এ সময়ে যদি বিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদি জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকে, তবে সে বিদ্যার ও সে ধর্ম্মের নাশ হইয়া যাইবে।

তিন বিপদ্ আমাদের সম্মুখে - (১) ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত বর্ণ একত্রিত হইয়া পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে; (২) বাহ্যদেশীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে; অথবা (৩) সমস্ত ধর্ম্মভাব ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রথম পক্ষে এই অতি প্রাচীন সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যাইবে। এই ভারতবর্ষ পুনরায় বালকত্বপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নতির পথে বহুকালান্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় কল্পে ভারতীয় সভ্যতার ও আর্য্যজাতির বিনাশ অতি শীঘ্রই সাধিত হইবে। কারণ, যে কেহ হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটী শত্রু অধিক হয়। ঐ প্রকার স্বগৃহ-উচ্ছেদকারী শত্রুদ্বারায় মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তৃতীয় কল্পে মহাভয়ের কারণ এই যে, যে ব্যক্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি পরিস্থাপিত, তাহা বিনষ্ট হইলে যে জাতিও নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যজাতির জীবন ধর্ম্মভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আর্য্যজাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

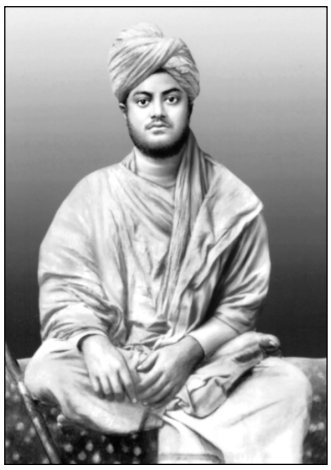

নদীবেগ আপনা হইতেই বাধাহীন পথ নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। সমাজের কল্যাণ-স্রোতও সেই প্রকার বাধাহীন পথে আপনা হইতেই চলে। অতএব সমাজকে ঐ প্রকার পথে লইয়া যাইতে হইবে।

এই ভারতবর্ষ স্বগৃহজাত ও বাহ্যদেশসমাগত বহু জাতিতে পরিপূর্ণ। আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যভাব ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে এখনও প্রবিষ্ট হয় নাই।

অতএব এই ভারতবর্ষকে প্রথমতঃ আর্য্যভাবাপন্ন করিলে, আর্য্যাধিকার দিলে, আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহা বিপদ্ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব। এই জন্য প্রথমতঃ যে সকল জাতি সংস্কারবিহীন হইয়া আর্য্যধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হইয়াছে, পুনঃসংস্কার দ্বারা আর্য্যজাতির ধর্ম্মে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। মনুষ্যের যেখানে অধিকার, সেখানেই তাহার প্রেম। নতুবা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ধর্ম্ম বলিয়া অন্যান্য জাতি পরিত্যাগ করিবে। ঐ প্রকার আচণ্ডাল সর্ব্বজাতিকে ও ম্লেচ্ছাদি বাহ্যজাতিকেও সংস্কারাদি দ্বারা হিন্দুসমাজকে বিস্তৃত করিতে হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অধুনা শাস্ত্রোক্ত অধিকারী হইয়াও যাহারা নিজ অজ্ঞতায় সস্কারবিহীন, তাহাদিগকে সংস্কৃত করা কর্ত্তব্য।

এই প্রকারে শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের প্রচার বহুল হইবে।

মুসলমান বা খ্রীষ্টানদিগকেও হিন্দু ধর্ম্মে আনিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে। কিন্তু উপনয়নাদি সংস্কার কিছুদিনের জন্য তাহাদের মধ্যে হওয়ার আবশ্যক নাই।

—ঃঃ—

সাম্যদর্শীর সুসমাচার

দীপ্তরূপ সাম্যদর্শী

বহুদুরে কোন এক গাঁয়ে কিছু নির্বোধ বাস করিত। তাহারা গরু টরু চরাইত, বেলাশেষে গরু জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইত। ওদিকে জঙ্গলে থাকিত একপাল হায়না। তাহারা সুযোগ সুবিধামত গরু কিম্বা গ্রামবাসী ধরিয়া খাইত। আহারান্তে বিপ্লব সফল করিয়া লেনিন (সকল বিপ্লব তাহাতে ধর্ষিত হউক) যেভাবে হাস্য করিতেন, সেইরূপে ''হিঃ হিঃ'' করিয়া হাসিত। সেই হাসি শুনিয়া গ্রামবাসীরা বড় ভীত হইত। এইরূপেই চলিতেছিল।

এমতাবস্থায় কোথা হইতে ক্রেম্লিনের মাকুওয়ালা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, ''ওহে গ্রামবাসীগণ, শোনো এই যে হায়নারা, ইহারা তোমাদের মারিয়া থাকে কেন জান? কারণ ইহাদের তোমরা দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছ। আপন করিয়া লও নাই, উহাদের সংস্কৃতি বুঝিতে চাহ নাই। উহাদের ভাই বানাও নাই।''

গ্রামবাসীগণ নির্বোধ ছিল। আর সমস্ত নির্বোধেরই সুশীল হইবার প্রবণতা থাকে। তাই উহারা ক্রেম্লিনের মাকুওয়ালার কথায় বড় খুশী হইল। তবে দুই একটা বেয়াদপ গ্রামবাসী কহিয়াছিল বটে ''উহারাও তো আমাদের সংস্কৃত বুঝিতে চাহে নাই। আমরা গরু জড়াইয়া ঘুমাই, আর উহারা খাইয়া লয়।''

কিন্তু তখন আমাদের মাকুভাই উত্তেজিত স্বরে গলা কাঁপাইয়া কহিলেন, ''হে সর্বহারা গ্রামবাসী, বরফ যুগের পর যখন সুশীলযুগের পত্তন হইতে যাইতেছে তখন এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল কথা বলিয়া তোমাদের সদ্যোত্থিত সুশীলতাকে যুক্ত নিতম্বপ্রহার করিতে চাহে এই বেয়াদপেরা। বিপ্লবের এই সন্ধিক্ষণে তোমাদের সংস্কৃতি বড় হইল? এই ভোগবাদী, আত্মস্বার্থবাদী পশ্চিমা লুঠেরা সংস্কৃতির ক্রীড়নক মানসিকতা ত্যাগ করিয়া বিপ্লবী চেতনায় রাঙাইয়া লও নিজেরে। নিজ সংস্কৃত দূরে গিয়া মরুক, হায়নাদের সংস্কৃতেই নিহিত আছে বিপ্লবের কল্যাণ। গরু জড়ানো আবার একটা সংস্কৃতি হইল? সংস্কৃতির কথা বলিতে হইলে বানু কুরাইজার উদাহরণ আছে, গুলাগ আছে, বাট ইয়ে গরু গরু ক্যা হ্যায়, ইয়ে গরু গরু?''

বস্তুত গরুর বীরত্বের শেষ উদাহরণ বশিষ্ঠ মুনির আমলে হওয়ায় এই কলিকালে গরু শুধুই হাম্বার উপর উঠিতে পারে না। ফলতঃ জনতা চমকিত হইল। তাহার পর উত্তেজিত হইল। তাহার পর বেয়াদপোপরি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল। মাকুর্বচনে তাহারা সুশীলতার তুরীয় দশাপ্রাপ্ত হইল। এই গোলমালে আসল প্রশ্ন চাপা পড়িয়া গেল। তাহারা বেয়াদপদের উত্তমরূপে গালাগালি করিয়া ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া একঘরে করিয়া দিল। শুধু তাহাই নহে পিবিজিবিসিসিপিসি সব ডাকিয়া স্থির হইল, হায়নাগণের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ করিলেই তাহাকে বেয়াদপ বলে ঘোষণা করিয়া একঘরে করা হইবে। একঘরে হইবার ভয়ে হায়নানিরপেক্ষ দলে জনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা হায়নাবদনে স্বীয় ভ্রাতৃমুখকৌমুদী দর্শনের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রকল্প চালু করিলেন।

কিন্তু হায়নারা পরদিন দুইটা গ্রামবাসী একসাথে খাইল। লোখমুখে শোনা গেল উক্ত প্রাত গ্রামবাসীরা তখন হায়নার মধুর বদনে নাকি বড় পরিচিত কোন মুখসাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইয়া বড় নিকটে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই এই বিপত্তি। আমাদের ক্রেম্লিনের মাকুওয়ালা সগর্জনে কহিলেন, ''ইহা গুজব, কারণ এমন কিছু ঘটে নাই, এবং ইহা বেয়াপদের কীর্তি, কারণ তাহারই হায়নানিরপেক্ষ ভ্রাতাদিগকে মারিয়া শুভ্রচরিত্র হায়নাগণকে বদনাম করাইতেছে, এবং ইহা আমেরিকার ষড়যন্ত্র যাহাতে পুষ্পবৎ নিষ্পাপ হায়নাগণকে দিয়া এসব করানো হইয়াছে।''

একসাথে এতপ্রকার বহুনির্দেশী তত্ত্ব পাইয়া হায়নানিরপেক্ষরা খুশীতে উন্মাদপ্রায় হইয়া দিকে দিকে পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করিলেন এবং হায়নারা পুনরায় যথারীতি জনা তিনেককে খাইল। অনেককে বেয়াদপ ঘোষণা করিয়া এযাত্রা আমাদের হায়নানিরপেক্ষরা গ্রামের প্রগতি কোনক্রমে বাঁচাইলেন। তবু জনরোষ রহিল। অতঃপর পিবিজিবিসিসিপিসি ডাকিয়া ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, হায়নাগণকে এখনো পর্যন্ত যথেষ্টপ্রকার ভ্রাতায় পরিণত না করা যাওয়াতেই এই বিপত্তি। ক্রেম্লিনের মাকুভাই তখন বিপ্লব দীর্ঘজীবী করার স্বার্থে আমেরিকা বা ইটালি কোথাও একটা চামড়া টান করাইতে গিয়াছিলেন। তাই তাহার অবর্তমানে আশুপ্রক্রিয়া হিসাবে খিচুড়ি কর্মসূচী লওয়া হইল। পাঞ্চলাইন হইল ''তোমরা উহাদের খিচুড়ি খাওয়াও, উহারা তোমাদিগকে আঁটি বাঁধিয়া দিবে''।

কিন্তু হায়নারা খিচুড়ির কথায় ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইল। খ্যাক খ্যাক, ম্যাক ম্যাক করিয়া গ্রামের পথঘাট ফাটাইয়া ফেলিল। এসব শুনিয়া বেজিং বা হাভানার কোন দুর্গম স্থান হইতে ঠোঁটে চুরুট চাপিয়া মাকুভাই কহিলেন, ''করিয়াছ কি? তোমরা সকলেই

বেয়াদপ নাকি? হায়নানিরপেক্ষ গ্রামে হায়নার শান্তিপূর্ণভাবে নিজধর্ম পালনের অধিকার থাকিবে না সে কি প্রকারে হয়?"

গ্রামবাসীদের মনে মনে ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল। হায়নার দাঁতের বহরে তারা ভীত হইলেও মনে মনে হায়নাপ্রেমে বিলক্ষণ ঘাটতি পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একদল বলিয়াই বসিল, ''তাহারা তো আমাদের খাইতেছে সুযোগ পাইলেই। গত সপ্তাহে নিমাই শীলের মেয়ে পূর্ণিমা শীলকে একসাথে পনেরটি হায়না মিলিয়া চাটিয়া পুটিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। নিমাই শীল এক এক করিয়া খাইতে বলিয়াছিল, তাহার সেই সাংস্কৃতিক অনুরোধটুকুও রাখে নাই হায়নাগণ। গতকল্য শুনিয়ছি, রজকের কন্যাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে খাইতে দিতে রাজি না হওয়ায়। জাতি কি এমন হায়না চাহিয়াছিল?"

মাকুভাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভেংচাইয়া কহিলেন, ''শালা লুম্পেন, গরুর শাবক কোথাকার। হায়নার ধর্ম কি হবিষ্যিভোজন? তাহার ধর্ম মানুষ খাওয়া। সকল বিজ্ঞানের যাহা উৎস সেই কিতাবে স্পষ্ট লিখিত আছে। ফলে শান্তিস্য পুত্রাঃ হায়নাগণ নিজধর্ম পালন করিলে তোমাদিগের এত সমস্যা কিসের বাপু? উহাদের শ্বদন্ত বর্তমান, উহারা তাহা ব্যবহার করিতেছে। সম্পূর্ণ জীববিজ্ঞান তো! নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক বেয়াদপ না হইলে তো এত গাত্রদাহ হইবার কথা নয়। শীল বা রজকেরা কাঁদিয়া সময় নষ্ট না করিয়া হানিমুন করিয়া আসুক। কিন্তু কোনভাবেই এই খিচুড়ি কর্মসূচী করিয়া হায়নাদিগের ভাবাবেগে আঘাত করা সমর্থন করিতে পারিব না। আমাদের আরও হায়নাবিক হইতে হইবে। হায়নারা তখনই তোমাদের আপন করিবে যখন তোমরা এক একটি উপযুক্ত নওহায়না হইতে পারিবে। ইহাই তাহাদের ধর্ম। অতএব উহাদের আঘাত না করিয়া হায়না হইয়া যাইতে পার, বা হায়না ঐক্যে সামিল হইয়া উহাদের খাদ্য হইতে পার। তাহার পর সকলে মিলিয়া বিপ্লব করিব।"

মাকুভাইয়ের যুক্তি যে অকাট্য তাহা গ্রামবাসীরা বুঝিলেন। যতই নির্বোধ হন হায়নাদিগকে যে খিচুড়ি খাওয়ানো উহাদিগের জৈবিক ধর্ম অনুসারেই অসম্ভব তাহা তারা স্পষ্ট হৃদয়সঙ্গম করিলেন। মাকুভাইয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখের সহিত হায়নামুখসাদৃশ্য বড় প্রকট হইল অনেকের মানসপটেই। কিন্তু মুখে তাহা বলিলেই বেয়াদপ বলিয়া হায়নানিরপেক্ষরা একঘর করিতেছে।

আপাতত একঘর একঘর করিতে করিতে বেয়াদপদের ঘর বাড়িতেছে। হায়না ও হায়নানিরপেক্ষরা পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। বিপ্লব আসন্ন।

* * * * *

আমি নিরীহ বেড়াল, আপনাকে গল্প শুনাইতে শুনাইতে চুপি চুপি একটা কথা বলি। চাপা পড়া আসল প্রশ্নটি হইতেছে, হায়নাদের পর করা হইয়াছে, নাকি হায়নারা সকলকে হায়নাধর্মের কারণে পর করিয়াছে? আমাকে মৎস খাওয়া হইতে বিরতকরণ যেমন অবৈড়ালিক, হায়নাগণকে খিচুড়িভোজী হইবার কথা বলাও তাই। অতএব যদি হায়নাধর্ম না লইতে চান, তবে হায়নাদিগের জন্য হায়নাদিগের আইন জারি করুন। হায়নার জন্য সম্পূর্ণ হায়নাবিক আইন, মনুষ্যের জন্য সম্পূর্ণ মানবিক আইন, বিড়ালের জন্য বৈড়ালিক আইন। না মানিলে ডাণ্ডা রেডি করুন। হায়নাবিক আইনে ডাণ্ডা প্রয়োগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হায়নাদের আরও উৎসাহিত করুন হায়নাবিকতা প্রদর্শন করিতে। ভাবিতেছেন, বিড়াল হইয়া আপনাদিগের ন্যায় মনুষ্যকুলকে সুসমাচার দিতেছি কেন? কারণ মনুষ্যকুল নিতান্ত নির্বোধ। উহারা সুশীলসাগরে অত্যন্ত দ্রাব্য। ফলে উহাদের জাগাইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের অবশ্যকর্তব্য। তাছাড়া হায়নাদের জঙ্গল তো হায়নারা পাইয়াছেই। এখন গ্রামে ঢুকিয়া নিরীহ বেড়ালের ভাত মারিতেছে কেন?

নেতা এবং বিদ্বান মানুষদের মধ্যে একজনও মেরুদণ্ডী প্রাণী নেই যিনি বলতে পারেন যে এখানে অসুবিধা হলে তোমরা ইসলামিক রাষ্ট্র অর্থাৎ নিজের দেশে চলে যাও। বলতে পারে না জিন্নার অন্তিম ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে লোক বিনিময় করে নাও। চিরদিনের জন্য ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যাক্। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ভাগ করার পরেও ইচ্ছা করে এদেশে হিন্দু মুসলমান সমস্যা জীবিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকেও এই অভিশাপ যাতে বহন করতে না হয় তারজন্য লোক বিনিময় প্রকৃষ্ট সমাধান। ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, গান শ্লোগান দিয়ে ভারতভাগ রোধ করা যায়নি। মাত্র ছেচল্লিশ বছর আগে ফলিত ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না। কেবল তাপ্পি দিচ্ছেন, রিপু করছেন, রাং ঝাল লাগাচ্ছেন। ***—শিবপ্রসাদ রায়***

বাঙালির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে

তপন ঘোষ

বাঙালি হিন্দু বাঁচবে কি বলা কঠিন। তবে মনে হয় বাঁচবে না। মানুষগুলো মরবে না। কিন্তু বাঙালি থাকবে না।

অনেকগুলো কথা আছে।

প্রথমত, বাঙালি হিন্দু কথাটা পুনরুক্তি। হিন্দু ছাড়া বাঙালি হয় না, বাঙালি মানেই হিন্দু। যাদের মাতৃভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা, খাওয়াদাওয়া এই বাংলার মাটিতে অনেকদিন ধরে একইরকমভাবে চলে আসছে, তারাই বাঙালি। গোসল করে গোস্ত খেলে বাঙালি থাকা যায় না, তেমনি ইরফান হয়ে ফুফু, খালা বলেও বাঙালি থাকা যায় না। বাংলাদেশে কিছু ভীতু হিন্দু ও নাস্তিক মুসলমান এই একটা বাঙালি জাতি তৈরির চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হবে না; বড় জোর একটা নতুন বাংলাদেশি গোষ্ঠী তৈরী হবে, যারা আদ্যন্ত মুসলমান। সুতরাং বাঙালি মানেই হিন্দু, আর বাংলাদেশি মানেই মুসলমান-এই জায়গায় এসে শেষ হবে। বাঙালি মানেই তো হিন্দু, কিন্তু সেই বাঙালি থাকবে কি? টিকবে কি? মনে হচ্ছে টিকবে না। শুধু বাঙালি নয়, আরো দুটি গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে-কাশ্মীরি হিন্দু ও মালয়ালি হিন্দু। আশ্চর্যের কথা, এই তিনটি প্রজাতির মধ্যেই ভীষণরকম মিল। এই তিনটি প্রজাতিই তর্কবাগীশ, আড্ডা দিতে ও কথা বলতে খুব ভালবাসে।

এরপর আসা যাক একটু পরিসংখ্যানে। সারা বিশ্বে মোট বাংলাভাষীর মধ্যে ত্রিশ শতাংশ হিন্দু, কাশ্মীরিভাষীদের মধ্যে পনেরো শতাংশ হিন্দু এবং মালয়ালিভাষীদের মধ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ হিন্দু। অদ্ভুত মিল না! ভারতের আর কোন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই অবস্থা হয় নি, অর্থাৎ সেই ভাষায় কথা বলা লোকের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া। কী করে এই তিনটি ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেল, সেটা অত্যন্ত গভীর গবেষণার বিষয়। এই লেখা সেই গবেষণার পরিধির বাইরে। এই লেখার উদ্দেশ্য শুধু বর্তমান ঘটনাবলী, লক্ষণ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভবিষ্যতে পরিণতি বোঝার চেষ্টা করা।

অনেকগুলি তথ্য, ঘটনা ও পরিসংখ্যান এলোমেলোভাবে পেশ করব। পশ্চিমবঙ্গের চারটি বৃহত্তম শহর কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল ও শিলিগুড়ি। এই চারটি শহরেই আজ জনজীবন বা দৈনন্দিন চলাফেরা বা কাজকর্ম মারোয়াড়ি ও হিন্দিভাষী মানুষদেরকে বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না। এছাড়া দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, রিষড়া, কোন্নগর, ব্যান্ডেল, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, টিটাগড় প্রভৃতি আরও বহু শহরেরই একই পরিস্থিতি। এই শহরগুলির চারিদিকে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এগুলির উপরই তো অনেকটা নির্ভরশীল।

পরবর্তী খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আসামের বরাক উপত্যকায় অর্থাৎ কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে হিন্দু বাঙালি সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। তবুও তারা এখনও নিজেদেরকে বাঙালি বলেই মনে করে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অর্থাৎ ধুবড়ী থেকে গুহায়াটী হয়ে তেজপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় যে বাঙালিরা আছে, যারা বহুবার ভাষাদাঙ্গার শিকার হয়েছে, ভাষা বৈষম্যের শিকার হওয়া যাদের নিত্যসঙ্গী, তাদের অনেকেই ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে তারা আর বাঙালি পরিচয়কে বহন করবে কিনা! তাদের অনেকেরই মনে হচ্ছে যে বাঙালি পরিচয় নিয়ে তারা সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে না। তাই নিজেদের বাঙালি পরিচয় বিসর্জন দিয়ে অসমীয় পরিচয় গ্রহণ করবে কিনা। তিন, মহারাষ্ট্রে চন্দ্রপুর ও গড়চিরৌলি দুটি জেলায় কয়েক লক্ষ বাঙালি উদ্বাস্তু আছে। তারা এখনও বাংলায় কথা বলে, কিন্তু তাদের সন্তানদের লিখিত বাংলা ভাষা শেখানোর কোন সুযোগ নেই। তাই, সেখানকার বর্তমান প্রজন্মের বাঙালিরা বাংলা লিখতে ও পড়তে পারে না। এই উদ্বাস্তুদের প্রধান দাবি হল বাংলা মাধ্যম স্কুল চালু করা এই অবস্থায় তারা কতদিন বাংলা ভাষাকে ধরে রাখতে পারবে? চার, বিহার ও ঝাড়খন্ডে যে বাঙালিরা আছে, তাদের সন্তানরা স্কুলে গিয়ে বা বাড়ির বাইরে নিজেদের নামের পরে পদবী ব্যবহার করে না। অর্থাৎ নিজেদের বাঙালী পরিচয়কে লুকিয়ে রাখতে চায়। কারণ সহজবোধ্য।

এছাড়া বাঙালির বর্তমান নিজস্ব বাসস্থান সেখানে নির্বাধভাবে সে তার বাঙালি পরিচয় ও অস্তিত্বকে ধরে রাখতে পারবে, সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করতে পারবে, সেই জায়গাটা তো ১৯৪৭ সালে দুই-তৃতীয়াংশ সংকুচিত হয়ে আজ এই এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গভূমি পশ্চিমবঙ্গেই পরিণত হয়েছে। এইটুকু ভূমির মধ্যেও আবার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাঙালি সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে আরবীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। তাহলে আর বাকি থাকল কতটা? আর এই প্রক্রিয়াওতো থেমে নেই। বাঙালি সংস্কৃতির অবক্ষয় বা অবলুপ্তির এই প্রক্রিয়াকে হাওয়া দিয়ে ত্বরান্বিত করে চলেছে আমাদের পবিত্র গণতন্ত্র, অর্থাৎ

ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। মমতা ব্যানার্জী হিজাব পরেন, কিন্তু জ্যোতি বসু মোল্লাটুপি না পরেই পনেরো লক্ষ মুসলমানকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বসিয়ে দিয়েছিলেন। কেন? মোল্লাপ্রীতিতে নয়, বাড়তি ভোটব্যাঙ্ক তৈরীর জন্য। আজকে মমতা ব্যনার্জী দক্ষিণেশ্বরের পাশেই কয়েক হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে বসিয়েছেন ওই ক'টা বাড়তি ভোটের জন্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের তিরিশ শতাংশ মুসলিম ভোটের মুখ চেয়ে। গণতন্ত্রের এমনই মহিমা! কিন্তু ভুগতে হবে আমাদেরকেই।

আজকে আমরা মমতা ব্যানর্জী বা জ্যোতি বসুকেই যতই দোষ দিই না কেন, একটা তথ্য মনে রাখা দরকার। এনাদের মোল্লা তোষণের বদমাইসি শুরু হবার অনেক আগেই কিন্তু বাংলায় কথা বলা জনগোষ্ঠীর মধ্যে (ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে) প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ অহিন্দু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে বাঙালি সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে নিয়েছে। এর দায় আজকের ভোটলোভী রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপানো সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু এই দুর্ঘটনা, অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু ত্রিশ শতাংশ হয়ে যাওয়া, কী করে হল, তার সঠিক ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। নদীনালা বেষ্টিত দুর্গম পূর্ববঙ্গে একাত্তর শতাংশ মুসলমান হয়ে যাওয়া ১৯৪৭ সালে শুধু নবাব বাদশাদের অত্যাচারের ফলে হয়েছে, মানা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন, বা নাম সংকীর্তন কর্মসূচী বাংলাকে ইসলামীকরণের হাত থেকে রক্ষা করেছে - অনেকেই এটা মনে করেন। কিন্তু আমি কিছুতেই এটা বুঝতে পারি না, শ্রীচৈতন্য তাঁর ভক্তি আন্দোলন শুরু করার পর মাত্র ৭-৮ বছর বাংলায় থেকেছেন। তারপর দীর্ঘ আঠারো বছর, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নীলাচলে অবস্থান করেছেন। সেইসময় রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তারপরেও উড়িষ্যার মানুষ শ্রীচৈতন্যের নামধর্ম গ্রহণ করেনি বা তাঁর ভক্তি আন্দোলনে সামিল হয়নি। আজও উড়িষ্যার মুসলিম ২.৪ শতাংশ। যৌথ বাংলার সঙ্গে একবার তুলনা করে দেখুন। আশ্চর্য হতে হয় না কি? কারও কারও মতে উত্তর ভারত থেকে উড়িষ্যায় প্রবেশ করার প্রাকৃতিক দুর্গমতার কারণে উড়িষ্যা বেঁচে গিয়েছে। কী করে মেনে নিই? উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে তো সেই প্রাকৃতিক দুগর্মতা ছিল না। এই দুটি রাজ্যের উপর দিয়েই তো সমস্ত মুসলিম আক্রমণকারীরা এসেছে। আবার এইসব রাজ্যে হিন্দুধর্মের মধ্যে জাতপাতের ভেদাভেদও খুব ছিল, অস্পৃশ্যতা ছিল। তা সত্ত্বেও আজও উত্তরপ্রদেশে মাত্র আঠারো শতাংশ মুসলমান, বিহারে সতেরো শতাংশ মুসলমান। আর আমাদের যৌথ বাংলায় তাদের সংখ্যা সত্তর শতাংশ। তাই শ্রীচৈতন্যদের বাংলাকে রক্ষা করতে পেরেছেন- উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে তুলনা করে একথা কি করে মেনে নিই? আর একটা কথাও খুবই স্পষ্ট নয় কি? ১৭৫৭ সালে মুসলমানের হাত থেকে ইংরেজের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর না হলে বাংলার হিন্দুদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে যেত না কি? ভাগ্যিস দুঃশ্চরিত্র, লম্পট সিরাজদৌলা জগৎশেঠের বিধবা সুন্দরী কন্যার দিকে লালসার হাত বাড়িয়েছিল, তাই তো বাংলার হিন্দুর মুক্তিদাতা হিসেবে মিরজাফরের আবির্ভাব হল! তাই তো হল পলাশী! তাই তো হল ক্ষমতার হস্তান্তর! বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীর উল্লেখ করেছেন, যে 'সন্তান'দের কল্পনা করেছেন, তা বাস্তবে কতটা ছিল এবং তা আদৌ বাংলাকে যবন শাসন থেকে মুক্ত করতে পারত কিনা-এরকম কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা ইঙ্গিত তো পাওয়া যায় না। তাই মিরজাফর ও ইংরেজই বাংলার হিন্দুর মুক্তিদাতা হিসাবে এসেছিল। আর মীরমদন ও মোহনলালের মত সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতিরা বাংলায় যবন শাসন স্থায়ী করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এগুলি সব অপ্রিয় ঐতিহাসিক সত্য।

চলে আসি অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৭৫৭-এর পর বাঙালি হিন্দুর বোধহয় পুর্নজন্ম হল। তারপরে প্রায় একশো ষাট বছর যে বাঙালী গোটা ভারতকে নেতৃত্ব দিল, কোন্ মূলধন নিয়ে সেই নেতৃত্ব দিয়েছিল? সেই মূলধন কি ইংরাজী শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা এবং ইউরোপের সান্নিধ্য নয়? যে জাতীয়তাবাদ বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এখানে হল, তার পেছনে কি ইউরোপের ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির প্রেরণা কাজ করেনি? রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে সেদিন সেই উন্মেষের অগ্রদূতের অনেকেই কি ইউরোপ থেকে নতুন আলো ও স্বাভিমানের নতুন concept নিয়ে আসেন নি? এমনকি পশ্চিমী প্রভাব ছাড়া আমরা কি বিবেকানন্দ, অরবিন্দ বা সুভাষকে পেতাম?

কিন্তু রামমোহন থেকে শুরু করে শ্যামাপ্রসাদ পর্যন্ত যে উন্নত বাঙালিরা সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা বাংলার কথা কম চিন্তা করেছেন। খুবই কম চিন্তা করেছেন। বোধ হয় কেউই এর ব্যতিক্রম নন। স্বামী বিবেকানন্দের মত একটা চৌম্বক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে একটাও বাঙালি আলাসিঙ্গা-পেরুমল তৈরী হল না কেন? রাসবিহারী বোসও পাঞ্জাব ও দিল্লীতে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলায় তাঁর কয়জন অনুগামী ছিল? শ্রী অরবিন্দের জীবনের শুরু আর

শেষ দুটোই বাংলার বাইরের। মাত্র সাত-আট বছর বাংলায় তাঁর কর্মভূমি। এমনকি আমাদের প্রিয় শ্যামাপ্রসাদও কাশ্মীরের জন্য মরতে গেলেন, বাংলাকে দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের হাতে ছেড়ে দিয়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙালি (বাঙালি মানেই হিন্দু) সারা ভারতকে উপকৃত করছে, আলোকিত করেছে, প্রেরণা দিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছে, দিয়েছে দুটি রাষ্ট্রগান, দিয়েছে দুটি স্লোগান-বন্দে মাতরম ও জয় হিন্দ্। এমনকি বর্তমানে জনপ্রিয় স্লোগান 'ভারতমাতা কি জয়', তার মধ্যেও ভারতমাতা বঙ্গমাতা কনসেপ্টেরই বর্ধিত রূপ। মহারাষ্ট্র দেশমাতৃকা বা ভারতমাতা-র কনসেপ্ট আমরা দেখতে পাইনি। ভারতমাতা-র প্রথম চিত্র এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সুতরাং 'ভারতমাতা কি জয়' এর পিছনেও রয়েছে বাংলা ও বাঙালি। অর্থাৎ আমরা ভারতকে সব দিয়েছি, নিজেরটা দেখিনি, তাই আজ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি।

অনেকে তর্ক করবেন, এ তো টাকাপয়সা দেওয়া নয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রেরণা দিলে কেউ নিঃস্ব হয় না, বরং তা বাড়ে। এ তর্কের উত্তর আমি দিতে পারব না। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের দুটো উদাহরণ দিতে চাই। পৃথিবীর দুটি রিফিউজি জাতি হল ইহুদি ও পার্সি। পার্সিরা আছে ভারতে আর ইহুদিরা আছে সারা বিশ্ব জুড়ে। পারস্য দেশবাসী পারসিদেরকে ভারতের সবাই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ইহুদিরা চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র ছিল এবং বিদ্বেষ ও হিংসার শিকার ছিল। এমনকি সেকস্পিয়ারের মত মহান সাহিত্যিকও চরম ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন। উদাহরণ, 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' গ্রন্থে ক্রূর নিষ্ঠুর সাইলক চরিত্র।

এই দুই জাতির মধ্যে কী তফাৎ ছিল? ইসলামের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে এসে পার্সিরা ভারতের গুজরাটের যে রাজ্যে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের নেতা সেই রাজ্যের রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুধের মধ্যে মেশালে চিনি যেরকমভাবে থাকে, ঠিক সেইরকমভাবে পার্সিরা হিন্দু দেশে থাকবে ও সেই ভূমিকা পালন করবে। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রেখেছে। দাদাভাই নাওরোজি, জামসেদজী টাটা এবং আরও বহু পার্সি ভারতকে বহু দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন কোনরকম সমস্যা সৃষ্টি না করেই। কিন্তু আজকে? আজকে পার্সি জাতি বিলুপ্ত প্রায়। সারা পৃথিবীতে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতেও বিলোপের পথে।

আর ইহুদিরা? প্রায় ১৮০০ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে তারা ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের পাত্র হয়েছিল, তা কি একেবারে বিনা কারণে? তা কি শুধু তারা দেশত্যাগী ভূমিহীন রিফিউজি ছিল বলে? না, তা নয়। এক হাতে তালি বাজেনি। ইহুদিরা চরম স্বার্থপর ও গোঁড়া ধর্মান্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি দেখে ইহুদিদের আগের রূপ বোঝা কঠিন। অর্থাৎ ইহুদিরা নিজেরটা বেশি করে দেখত, নিজের ভাল বেশি বুঝত, স্বার্থপর ছিল। তাই পৃথিবীতে তারা এরকম ঘৃণার পাত্র হয়েছিল। কিন্তু আজ? পার্সি জাতির মতো আজ ইহুদিরা বিলুপ্তির পথে নয়, বরং নিজের ভূমিতে ফিরে গিয়ে সেখানে জাঁকিয়ে বসে সারা পৃথিবীতে তাদের দাপট ও প্রভাব ক্রমবর্ধমান। নিঃস্বার্থ পার্সি জাতি বিলীন হয়ে গেল, স্বার্থপর ইহুদি জাতি তাদের অস্তিত্বকে সুসংবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বনেতৃত্বের অংশীদার হয়ে গেল।

বাঙালি হিন্দু সারা ভারতকে আলোকিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে, সম্মানিত করেছে, মিষ্টতা দিয়েছে, (বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-রবিশঙ্কর-হেমন্ত-মান্না-কিশোর-ভূপেন হাজারিকা)। কিন্তু মানা-গড়চিরোলি-রুদ্রপুর-আন্দামান-আসামের বাঙালিদের দিকে তাকানোর অবসর কারো নেই। এমনকি বাঙালি বোদ্ধাদেরও নেই। সমস্ত মহানতা, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ও অন্তরের সম্পদ দিয়ে সারা ভারতকে সমৃদ্ধ করে বাঙালি আজ-নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। এই প্রজাতি টিকবে না। এদের মধ্যে একটা অংশ কোনরকমে বড়জোর হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। তারা রবীন্দ্র-শরৎ-বঙ্কিম-শরদিন্দু অন্য কোন ভারতীয় ভাষার অনুবাদ পড়বে। বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

(পুনশ্চঃ তপন ঘোষেরও কোন বাঙালি আলাসিঙ্গা পেরুমল জোটেনি। জুটেছে রবি রাঘবন, তামিল, হিউস্টন প্রবাসী)।

—ঃঃ—

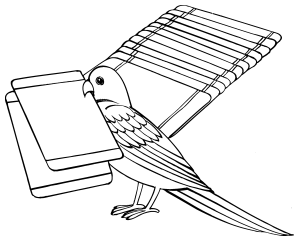

ভুলে গেছি সেই বিপ্লবী যতীন দাস-কে যাঁর সংকল্পের দৃঢ়তার সামনে শহীদ ভগৎ সিংকেও ম্লান লাগে

তপন ঘোষ

১৯২৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তেষট্টি দিন অনশনের পর বিপ্লবী বীর যতীন দাস লাহোর জেলে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। এ মৃত্যু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা সেদিন পরাধীন ভারতবর্ষে এক নতুন জাগরণ এনেছিল। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়কে লাহোরের রাজপথে একটি স্বদেশী মিছিল পরিচালনাকালে মেসার্স স্কট্ ও জে. পি. স্যান্ডার্সের নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী এমন প্রহার করে যে, তার ফলে তাঁর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা এ ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে তুলে নেন ও ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে বিপ্লবীদের গুলিতে জে. পি. স্যান্ডার্স নিহত হন। লাহোরের সব রাস্তা পোস্টারে ছেয়ে যায়- পরে ঘোষিত হয়- "Beware of Bureaucracy. The killing of J. P. Sanders was only to Avenge the murder of Lala Lajpat Rai... We are sorry that we had to shed human-blood on the altar of revolution which will end all explotation of man in the hands of man." এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লী অ্যাসেম্বলিতে ১৯২৯ সালে ৬ জুন যখন বিঠলভাই প্যাটেলের Speakership-এ সভা চলছে এবং Public Safety Bill, Trade Dispute Bill, Simon Commission এবং লালা লাজপৎ রায়ের শোচনীয় মৃত্যু নিয়ে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ সেদিন তা প্রকাশের ভাষা দিয়েছিল বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ওই অ্যাসেম্বলি হলে একটি উন্মুক্ত স্থানে কোনো মানুষকে হত্যা না করে সজোরে একটি বোমা নিক্ষেপ করে- তারই শব্দ ইংরেজ সরকারকে সচকিত করে। বোমা নিক্ষেপের ঘটনা একই দলের কাজ- এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে একটি ষড়যন্ত্রের মামলা সরকারি পরিকল্পনায় সংঘটিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'। সেই মামলায় ১৯২৯ সালের ১৪ জুন সকালে কলকাতায় টাউনসেন্ড রোড ও হাজরা রোডের মোড়ে দোতালায় একটি ঘর থেকে যতীন দাসকে গ্রেপ্তার করে লাহোর পাঠানো হয় এবং ১০ জুলাই পুলিশ স্যান্ডার্সকে হত্যার অপরাধে ও ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লাহোরে ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে, যাতে পাঞ্জাবের ভগৎ সিং, সুকদেব, রাজগুরু, বাংলার বীর সন্তান যতীন দাস প্রমুখ ১৭ জনকে আসামী করা হয়।

যতীন দাসের সেই মামলা চলাকালীন জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দাবি করে আমৃত্যু অনশন, সরকারি মহলে চাঞ্চল্য এবং দেশের নেতৃবৃন্দের অনুরোধও উপেক্ষা করে আদর্শ অনুযায়ী উদ্দেশ্যসিদ্ধ করবার একটা মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী চরিত্র যতীন দাসের সেই সময়কার সংকটমুহূর্তকালীন কথাবার্তায় যা প্রকাশ পায় সেই বিবরণ দেওয়া হল ঃ

১৬ আগস্ট তারিখের ঘোষণায় পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট যে জেল এনকোয়ারি কমিশন গঠন করলেন তার মধ্যে রইলেন- পাঞ্জাবের জেলসমূহের প্রধান পরিদর্শক (সভাপতি) আফজল হক মোহনলাল, হরবক্স সিং, মহীন্দ্র সিং, দৌলতরাম মালিয়া, চৌধুরী জাফরুল্লা, মহম্মদ হায়াৎ খাঁ ও কুরেশী আলি, পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রসচিব অগিলভি হলেন সেক্রেটারি।

ডা. গোপীচাঁদ ভার্গব জেল পরিদর্শনে এসেছিলেন। যতীন দাসের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট খইরুদ্দিন যেভাবে লিপিবদ্ধ করছেন তা উদ্‌ধৃত হল -

ডা. গোপীচাঁদ ঃ সুপ্রভাত মিস্টার দাস!

মিঃ দাস ঃ সুপ্রভাত (গলার স্বর অতি মৃদু)

ডা. গোপীচাঁদ ঃ আপনি জল ও ওষুধপত্র কিছু খাচ্ছেন না কেন?

মিঃ দাস ঃ আমি মরতে চাই।

ডা. গোপীচাঁদ ঃ কেন?

মিঃ দাস ঃ কারণ আমার দেশ, কারণ আমি রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা তুলে ধরতে চাই।

২১.৮.২৯ তারিখে ডা. গোপীচাঁদের সঙ্গে পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনও এসেছিলেন দাসকে দেখতে।

পুরুষোত্তম দাস ঃ আপনি আজ কেমন আছেন মিস্টার দাস?

মিঃ দাস ঃ খুব ভালো আমি।

পুরুষোত্তম দাস ঃ আপনার তো বেঁচে থাকা দরকার।

মিঃ দাস ঃ বেঁচে আছি তো!

পুরুষোত্তম দাস ঃ কোনো ওষুধ বা পুষ্টিকর কিছু না নিয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবেন?

মিঃ দাস ঃ আমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে।

ডা. গোপীচাঁদ ঃ একটু ওষুধ অন্তত খান। আপনার এই অনশনের ফল দেখবার জন্যে আরও দুসপ্তাহ আপনাকে বাঁচতে হবে। তারপর যদি দেখেন, আপনার দাবি পূর্ণ হয় নি, তখন যা খুশি করবেন।

মিঃ দাস ঃ এই গভর্নমেন্টকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না

পুরুষোত্তম ঃ আমার মনে হয় ডা. গোপীচাঁদ ঠিক কথাই বলেছেন। অন্তত আরও দু সপ্তাহ বেঁচে থাকবার জন্যে আপনার কিছু ওষুধ খাওয়া দরকার।

মিঃ দাস ঃ না। ওষুধ খাওয়া মানে এই নির্যাতনের মেয়াদ বৃদ্ধি মাত্র।

ভগৎ সিং ঃ এর আগের বারে আপনি আমার অনুরোধ রেখেছিলেন।

মিঃ দাস ঃ হাঁ। কিন্তু আপনি আবার এসেছেন কেন? এবারে আর আপনার কথা শুনতে রাজি নই। আপনি যান।

পুরুষোত্তম ও ডা. গোপীচাঁদ (একসঙ্গে) ঃ ভগৎ সিং তো নিজে আসেননি। আমরাই তাঁকে নিয়ে এসেছি।

মিঃ দাস ঃ ভগৎ সিং, আপনি আমার বুক ভেঙে দিয়েছেন।

ভগৎ সিং ঃ আমি এদের অনুরোধেই এসেছি। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করি আপনি আর পনেরোটা দিন বেঁচে থাকবার চেষ্টা করুন। আমাদের দাবি যদি না মেনে নেয়, তখন আমরা মরতে পারি।

মিঃ দাস ঃ আপনাকে গায়ের জোরে খাওয়ালো কী করে?

ভগৎ সিং ঃ আমি যতক্ষণ পেরেছি প্রতিরোধ করেছি। আমার অনুরোধ আপনি রোজ একপোয়া করে দুধ খান।

৩০ আগস্ট যতীন্দ্রনাথকে দেখতে এলেন ডা. গোপীচাঁদ, পন্ডিত শান্তনম, সর্দার শার্দুল সিং কবিশের ও ভগৎ সিং-এর পিতা সর্দার বিষণ সিং।

ডা. গোপীচাঁদ ঃ মিস্টার দাস, কেমন আছেন? উত্তর নেই।

ডা. গোপীচাঁদ ঃ আপনি তো কথা রাখলেন না। আপনি বলেছিলেন যে, এই কটা দিন বেঁচে থাকবেন। কিন্তু এভাবে কি সম্ভব?

তবুও কোনো উত্তর এলো না।

ডা. গোপীচাঁদ ঃ কেন ওষুধ খাচ্ছেন না বলুন তো?

কোনো উত্তর এলো না এবারেও।

ডা. গোপীচাঁদ ঃ আপনার মৃত্যু হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র একজন ছাড়া কমিটির আর সকলে সবগুলি দাবি মেনে নিয়েছেন। আপনি যদি চান, আমি তাদের এখানে আনতে পারি। আপনি আপনার কথা রাখুন।

যতীন দাসের কাছ থেকে তবুও কোনো উত্তর এলো না।

পন্ডিত শান্তনম্ বললেন- মিস্টার দাস, আমরা জানি মৃত্যু আপনার কাছে কিছুই না। আপনাকে আদর্শচ্যুত করবার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আমরা বলছি না, যে আপনি অনশন

ভঙ্গ করুন। ওষুধ খেয়ে ক'দিন বেশি বাঁচবার মানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি। কিন্তু তবু আমাদের জন্যে, জেল কমিটির অনুমোদনের ফল কী হয় শুধু সেইটুকু দেখবার জন্যে আপনাকে আরও ক'দিন বাঁচতে বলছি।

দাস জিতেন সান্যালের মুখের দিকে তাকালেন। সান্যাল নিচু হয়ে দাসের মুখের কাছে কান পাতলেন। এখন সামান্য নড়ল ঠোঁট। সান্যাল জানালেন অন্যদের- বলছেন, না।

ডা. গোপীচাঁদ ঃ কিন্তু আপনি কথা রাখছেন না। বলেছিলেন, দু'সপ্তাহ বেঁচে থাকবেন। এখনো তো চোদ্দ দিন হয় নি!

সান্যালের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন দাস, ৪ সেপ্টেম্বর চোদ্দ দিন পূর্ণ হবে। আমি বেঁচে থাকব। ডা. গোপীচাঁদ, পণ্ডিত শান্তনম্, সর্দার শার্দূল সিং একসঙ্গে অনুরোধ করতে লাগলেন দাসকে- জেল কমিশন আসবে আপনার সামনে। আপনাকে যে কথা বলতে হবে। বমি বন্ধ করার জন্য একটু ওষুধ আর চিনির জল খেতে হবে। দাস তখন বললেন- শিব শর্মা, সান্যাল আর ঘোষ কী বলেন?

তাঁরা তিনজনেই ব্যগ্র হয়ে বললেন- আমরাও তাই বলি। দাস রাজি হলেন ওষুধ দিয়ে সামান্য একটু সোডার জল খেতে।

ভগৎ সিং-এর পিতা সর্দার বিষণ সিং নিঃশব্দে শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কোনো কথাই বললেন না। জেল এন্‌কোয়ারি কমিটির সভ্যরা লাহোর বোস্টাল জেলে এসে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে তাঁরা কথা দিলেন যে, লাহোর-বন্দীদের সমস্ত দাবিই তাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন, তাঁরা আরো বললেন যে, যতীন দাসের বিনাশর্তে মুক্তির ব্যবস্থাও তাঁরা করবেন।

জেল কমিটি তাঁদের রিপোর্টে একবারও বলেন নি যে যতীন্দ্রনাথকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক। তাদের অনুমোদন ছিল- গভর্নমেন্ট অবিলম্বে তাঁর মুক্তির আদেশ দিন- এই আমাদের অনুরোধ। এই ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নিচের চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। চিঠিটি লিখেছিলেন পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি সি. এম. জি. অগিলভি স্বরাষ্ট্রসচিব মার্সনের কাছে। ওই নোটে এটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে যতীন্দ্রনাথ দুমাস অনশনে থেকে মৃত্যুমুখী হওয়া সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট তাঁকে মুক্তি দিতে ভয় পাচ্ছেন। জেল এন্‌কোয়ারি কমিটির অনুরোধ সত্ত্বেও যতীন্দ্রনাথকে মুক্তি দেওয়া হল না।

মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- আমি মরতে চাই। বিপ্লবীর কাছে দেশ একমাত্র সত্য, জীবন ও মৃত্যু তার 'পায়ের ভৃত্য'। দেশের জন্যে রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার জন্যে মৃত্যুকে বরণ করতে চাইলেন আত্মঘাতী পুরুষ। মৃত্যু তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়াল।

বিপ্লবী নায়ক শ্রীভূপেন রক্ষিত রায় তাঁর বই 'সবার অলক্ষ্যে'তে লিখেছেন- বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবযুগের প্রধান অবদান হল 'মার্টারডম' বা আত্মদানের শিক্ষা। 'ভাবনাহীন চিত্তে জীবন ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্যরূপে গ্রহণ করবার তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়েছে অজস্র বিপ্লবী শহিদের আত্মোৎসর্গে, শত সহস্র বিপ্লবী-কর্মীর দুর্জয় কর্মকাণ্ডে, বিপ্লবীর সাহস, মৃত্যুভয়হীনতা, কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও বৃহৎ-এর পানে সমুন্নত দৃষ্টিই জাতির বেঁচে থাকার সঞ্চয়। বিপ্লবের ইতিহাস মিউজিয়ামে যত্ন করে তুলে রাখার বস্তু নয়, ইহা জীবনপথে নিত্য কাজে লাগাবার সম্পদ।

বিপ্লব জাতিকে নেতিবাদ শেখায় না, সে যা দেয় তা 'ডিরেক্ট' ও 'পজিটিভ্'। বিপ্লবী শুধু ধ্বংসের বার্তা শোনান না। তাঁর কণ্ঠে একই সঙ্গে ধ্বনিত হয় ধ্বংস ও সৃষ্টির আহ্বান। তাঁর বাণী তাই চিরন্তন। সে-বাণী লালন করতে হয় সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্বক্ষণ।

'কাপুরুষ ও মূর্খরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়—সংস্কৃত প্রবচনে এইরূপ আছে।' কিন্তু বীর পুরুষরাই মাথা উঁচু করিয়া বলে, 'আমিই আমার অদৃষ্ট গড়িব।' যাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহারাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়। যুবকেরা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে ঘেঁষে না। গ্রহবৈগুণ্যের প্রভাবে আমরা হয়তো আছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের বেশি কিছু আসে যায় না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহারা নক্ষত্র গণনা, এরূপ অন্য বিদ্যা বা মিথ্যা চালাকি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের সর্বদা বর্জন করিবে।' তিনি ইহা জানিতেন, তাঁহার মতো শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ পর্যন্ত কেহ জন্মান নাই। নক্ষত্রগুলি আসুক, তাহাতে ক্ষতি কি?

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাদেশে ২০০১ সালে অক্টোবরের সেই রক্তাক্ত দিনগুলি

দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে গতকালের মতো আজও রাহুলরা চারজন বেরিয়ে গেল। আজ বেরিয়েছে খুব ভোরে। সূর্য ওঠার আগে। প্রাতরাশ করবে দৌলতখান বাজারে গিয়ে। সেখানে স্পট ভিজিট করে যাবে লালমোহনের উমেদচর গ্রামে। তারা দৌলতখানের লেজপাতা গ্রামে এল প্রথম। আনিসই তাদের এই গ্রামে প্রথম নিয়ে এল। লেজপাতা গ্রামের সরকার বাড়িতে তেরোটি হিন্দু পরিবার বাস করে। বাড়ির কোনো পুরুষের গায়েই কাপড় নেই। সবাই গামছা পরিহিত। নতুন গামছা। বাজার থেকে বাকিতে আনতে হয়েছে। ঘরের কিছু তো রাখেনি, পরনের কাপড়ও লুট করে নিয়েছে। উলঙ্গ করে সরকার বাড়ির প্রতিটি পুরুষকে হকি স্টিক দিয়ে পিটিয়েছে নির্বাচনের পরদিন রাতে। এ বাড়ির সকলেই যখন ঘুমিয়েছিল, পঁচিশ থেকে ত্রিশজনের একটি দল এসে বিকট শব্দে বাড়ির উঠোনে বোমা ফাটায়। বোমার শব্দে বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে যায়। পরেশচন্দ্র মিস্ত্রীর স্ত্রী প্রভারানি রাহুলদের জানায়, বোমা বিস্ফোরণের পর সন্ত্রাসীরা 'নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে আমাদের দরজায় আঘাত করে। প্রভারানি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে ঘরের পেছনের পুকুরে লাফিয়ে পড়ে শুধু নাক ওপরে রেখে বাকি সমস্ত শরীর জলে ডুবিয়ে নিজেকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু নরপশুরা টর্চলাইট মেরে চুল ধরে টেনে তোলে প্রভারানিকে। পুকুরের পাড়েই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। তার নাক-ফুলটি পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। এসব বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রভারানি। এই বাড়ির চার যুবতী মেয়ে বীণা, পলি, মিলন, শিপ্রা দৌড়ে হোগলাপাতার বনে গিয়েও ইজ্জত বাঁচাতে পারেনি, কাঁদতে কাঁদতে জানায় প্রভারানি। রিঙ্কু নামে পাঁচ বছরের একটি বাচ্চাকে দেখিয়ে বলে, ওর নাকের মাংস ছিড়ে নিয়ে গেছে নাক-ফুল লুট করার সময়। মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা ভ্যান ও রিক্সা নিয়ে এসেছিল। বাবা-মায়ের সামনে কন্যাকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে উলঙ্গ করে উল্লাস করেছে প্রথমে। তারপর ধর্ষণ করেছে, পর্যায়ক্রমে। যাবার সময় পনেরোটি ভ্যান ও রিক্সা ভর্তি করে সরকার বাড়ির তেরো পরিবারের তৈজসপত্র, বিছানা, কাপড়, সামান্য ধান-চাল যা ছিল সবকিছু নিয়ে যায়। এ বাড়ির দুই পরিবারের তিনটি গরু ছিল, তাও নিতে ভুল করেনি।

এখান থেকে রাহুলরা আসে চরপাতা ইউনিয়নের অঞ্জুরানি মেম্বারের বাড়িতে। অঞ্জুরানি চরপাতা ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্যা। কিন্তু সে বাড়িতে নেই। নির্বাচনের আগের দিন মুখোশ পরে একদল যুবক ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার চারদিন আগে অঞ্জুরানির ঘর থেকে টেলিভিশন ও অন্যান্য আসবাবপত্র লুট করে। তার পনেরো দিন আগে খুন হয়েছে অঞ্জুরানির বডিগার্ড। রাহুলদের এসব জানায় অঞ্জুরানি মেম্বার বাড়ির নিত্যহরি রায়। হাওলাদার বাড়ির বৃদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি হাওলাদার তাদের জানায় সুপারিবাগান, বাড়িঘর সব কিছু লুট করা হয়েছে। গত পাঁচবছর তাদের মধ্যে কোনো ভয়, আতঙ্ক ছিল না। কিন্তু নির্বাচনের পরদিন থেকে এখানকার আওয়ামি লিগের নেতারা সব পালিয়ে গেছে। তারা উপস্থিত থাকলে আমাদের এত বড়ো ক্ষতি হত না।

চরদুয়ারি গ্রামের হিন্দুবাড়ির যুবতীদের ওপর একের পর এক নির্যাতন করা হয়েছে। সব কিছু হারিয়ে বাড়ির মেয়েরা প্রায় উন্মাদ। তারা বাড়ির দরজা খুলে আছে এবং একটি বাড়ির গেটে লিখে রেখেছে 'যা খুশি কর'। এই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল না রাহুলরা। বারি অবশ্য কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু আনিস থামিয়ে দিল। এর আগে সে এই এলাকা একবার ঘুরে গেছে। পুরুষ দেখলেই এই মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের উপর একদিন নয়, ধারাবাহিকভাবে পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। তারা এখন উন্মাদ। বাইরের পুরুষদের দেখলে তারা আর ভীত হয় না। নরপশু তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। এজন্য বাইরের পুরুষ দেখলে তারা ভাবে নতুন কেউ এসেছে সেই ক্ষত আরও একটু বাড়ানোর জন্য।

পাগলের বেশে রাস্তায় হাঁটছে নূরজাহান বেগম। ওরা মোটরসাইকেল থামায়। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে নূরজাহান বলে, এসব কথা লিখবেন না। তাহলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। অসিত বালার বাড়িতে কাজ করে নূরজাহান। বারো হাজার টাকা দিয়ে অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছে অসিত বালা। কিন্তু এই টাকার কথা কাউকে বললে তাদের সবাইকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। বালা বাড়িতে প্রতি বছর ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা হয়। এবার পূজামণ্ডপ খালি। পূজামণ্ডপের সামনে ব্যথিত কুকুর কাঁদছে। অসিত বালা বারো হাজার টাকা দিয়ে নিজে নির্যাতন থেকে বেঁচেছে বটে কিন্তু ও বাড়ির অন্যান্য শরিকদের কেউ রেহাই পায়নি। অসিত বালা নির্বাচনের আগে বাড়ির মেয়েদের মির্জাকালু শ্বশুরবাড়িতে

পাঠিয়ে দিয়েছিল। নূরজাহান তার রান্নাবান্নার কাজ করে দিত। অসিত বালা রক্ষা পেলেও তার কাজের মেয়ে নূরজাহান রক্ষা পায়নি। তারপর থেকেই সে পাগলের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। নিজের কথা কিছুই বলে না। শুধু সাংবাদিক শুনলে বলে, এসব কথা লিখবেন না। ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।

আনিস জানায় এবার আমরা চরকুমারী গ্রামে যাব। অক্টোবরের দুই তারিখে নির্বাচনের পরদিন রাতে কী ঘটেছিল সে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে চরকুমারী গ্রামের মধ্যবয়সী নেপাল রায়। গ্রামের তেলি বাড়িতে বসে সে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল রাহুলদের। ফরিদ খালিফা এই গ্রামে ধার্মিক মানুষ হিসেবে পরিচিত। সে এসে জানায়, বাড়িতে হামলা হতে পারে। হামলাকারীরা বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে গেলে তা ফিরে পাবে। নতুন করে কিনতে পারবে। কিন্তু বাড়ির আওরতদের ওপর হামলা হলে তা আর ফিরে পাবে না। নেপাল রায়রা আপদে-বিপদে ফরিদ খালিফার কাছে ছুটে গেছে সব সময়। তাকে মুরুব্বি হিসেবে মান্য করে। তিনিই যখন বাড়িতে এসে হামলার কথা বলছেন, তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

নেপাল জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমরা কী করব?

ফরিদ জবাব দেয়, আওরতদের দূরে কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

নেপাল বলে, কিন্তু এখন তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আপনার দল তো জিতেছে, আপনি একটু ওদের বলে আমাদের রক্ষা করুন।

ফরিদ কিছুটা রেগে গিয়ে বলে, যারা হামলা করবে তাদের তো আমি চিনি না। শুনেছি হামলা হতে পারে। একটা কাজ করতে পারো, আজকের রাতটা বাড়ির আওরতদের আমার বাংলাঘরে পাঠিয়ে দিতে পারো।

নেপাল সরল বিশ্বাসে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। ফরিদ খালিফা আজকের রাতটা বাড়ির তিশ-পঁয়ত্রিশ জন নারীকে বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে যে উপকার করলেন, তা সে সারা জীবন মনে রাখবে। রাত পোহালেই দূরের কোনো আত্মীয় বাড়ি পাঠিয়ে দেবে স্ত্রী, কন্যা ও বিধবা বোনকে। অন্যান্য শরিকরাও তাই স্থির করে। ফরিদ খালিফার বাংলাঘরে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন বিভিন্ন বয়সের নারীরা কেউ ঘুমিয়েছে, কেউ অন্ধকারে উপরের দিকে তাকিয়ে বাড়ির কথা, ঘরের কথা ভাবছে। এ সময় ফরিদ খালিফা এসে ডাক দেয়। প্রথম ডাকে কেউ জবাব দেয় না। দ্বিতীয়বারও নয়। তৃতীয়বার দরজায় ধাক্কা মেরে যখন ডাকে, তখন একজন উঠে দরজা খুলে দেয়, যে দরজা খুলে দেয় সে নেপালের কন্যা। এবার ক্লাস নাইনে পড়ছে। ফরিদ মেয়েটির মুখে লাইট মারে। তারপর পুরো শরীরে। এরপর পুরো ঘরে। তড়িৎগতিতে টর্চলাইট দরজার বাইরের দিকে ঘুরিয়ে কাদের যেন ভেতরে আসতে আহ্বান করে। একদল নরপশু হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে। ফরিদ নেপাল রায়ের মেয়ের হাত ধরে রেখেছে এক হাতে। সবার ভেতরে ঢোকা হয়ে গেলে অপর হাতে দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপর একজনকে হারিকেন জ্বালাতে বলে। সবার উদ্দেশ্যে একটি চকচকে ধারালো ছুরি দেখিয়ে জানিয়ে দেয়, কেউ চিৎকার করলে এই ছুরি তার গলায় বসে যাবে। তারপর নেপাল রায়ের মেয়েকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরের এক কোণে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গায়। রাত বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশজন নরপশু এই নারীদের শরীর খুবলে খায়। নেপাল রায়ের মেয়েটি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন ফরিদ ডাকে নেপালের স্ত্রীকে। রক্তাক্ত কন্যাকে দৌড়ে গিয়ে বুকে তুলে নিতে যাচ্ছিল সবিতা। কিন্তু ফরিদ এক ঝটকায় সেখান থেকে ছিনিয়ে আনে সবিতাকে। বিবস্ত্র করে মেয়ের পাশে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দেয় সবিতাকে। আর বলতে পারে না, নেপাল রায় - অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

(লেখক ঃ সালাম আজাদ)

প্রত্যেক নূতন উদ্যম, এমন কি ধর্মপ্রচারের নূতন উদ্যমও জগৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া বিরক্ত হইও না। তাহাদের অপরাধ কি? কতবার কত লোকে তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। যতই সংসার কোন নূতন সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখে, অথবা উহার প্রতি কতকটা বৈরভাবাপন্ন হয়, ততই উহার পক্ষে মঙ্গল। যদি এই সম্প্রদায়ে প্রচারের উপযুক্ত কোন সত্য থাকে, যদি বাস্তবিক কোন অভাব-মোটনের জন্যই উহার জন্ম হইয়া থাকে, তবে শীঘ্রই নিন্দা প্রশংসায় এবং ঘৃণা প্রীতিতে পরিণত হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

একটি গ্রামের পাল্টে যাওয়া কাহিনী

শ্রী নিহারণ প্রহারণ

নাসের শেখ, পেশায় মৌলানা; বয়েস সাকুল্যে ৪৪। তিনি দেখতেও যেমন অদ্ভূত, তার কথাবার্তা, কাণ্ডকারখানা-আরও বেশি অদ্ভূত। উচ্চতা আর কত হবে? খুব বেশি হলে, মেরে কেটে ৫ফুট ২ইঞ্চি! কিন্তু হলে কি হবে? এই খর্বাকৃতি মানুষটি'ই হলেন কলকাতা থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে বাংলাদেশ ঘেঁষা পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর লাগোয়া 'কেবল' নামের ছোট্ট একটি শহরের এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। সেখানে একডাকে কে না চেনেন তাকে?

স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম তিনি। মসজিদ সংলগ্ন একটি খারিজি (সরকারী নিয়ন্ত্রণবিহীন) মাদ্রাসাও চালান তিনি। তার আরও একটি বৈশিষ্ট হল, বাংলা ও বিহারী মেশানো এক কিম্ভূতকিমাকার ভাষাতে কথা বললেও (কেবল এলাকাটি'র অবস্থান বিহার-বাংলা সীমানায়) আরবিতে তিনি তুখোড়। মজা করে মডারেট মুসলিমরা যাকে ''ছোটা ভাইকা পায়জামা ঔর বড়ে ভাইকা কুর্তা'' বলেন, (ছোট ভাইয়ের পায়জামা, যা কিনা সবসময়ই খাটো হওয়ায় গোড়ালির উপর উঠে থাকে; আর বড় দাদার কুর্তা, অর্থাৎ যে কুর্তা যতদূর সম্ভব হাঁটুর নিচে ঝুলে থাকে) তেমন ধরণের পোষাকেই তাকে দেখতে অভ্যস্ত। বাদামি হেনা করা চুল, গোঁফ কামানো একমুখ ঘন দাড়ির মাঝে সুর্মা মাখা চোখদুটিতে যেন সাপের শীতল চাহনি। হাতে জপমালা, আর সমস্ত শরীরময় ছড়িয়ে থাকা আতরের উগ্র গন্ধ যেন খুব সহজেই তাকে অন্যান্যদের মাঝে চিনে নিতে সাহায্য করে। এলাকাবাসী যে মানুষটার কথায় সর্বদা ওঠে আর বসে, সেই 'মৌলানা সাহেবে'র কাজই হল বিভিন্ন ইসলামিক ধর্মীয় বিষয় তথা নিকাহ, তালাক প্রভৃতি ব্যক্তিগত ব্যাপারসহ অন্যান্য আরও বহু কিছু ক্ষেত্রে শরিয়তি বিধান দেওয়া।

নাসের নিজেকে সবসময় 'সহি মুসলমান' বলেই মনে করেন। তাই জীবনে কখনও ছবি তোলেন না। তার গোটা মাদ্রাসা তথা তিন কামরার ঘরের ভিতরে কোথাও কোন ছবি দেখতে পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, একেবারেই যে কোথাও একটাও ছবি নেই তাও নয়,-ছবি একটা আছে বটে, আর তা হল 'আল-আজহার আল আসওয়াদ' বা 'মক্কার কাবা পাথরে'র।

মাদ্রাসাতে প্রতিদিন যেখানে ৮ থেকে ১৮ বছরের ৭২টি শিশু একনিষ্ঠভাবে তাদের কোরান সহ অন্যান্য ইসলামিক ধর্মীয় বিষয়ে পাঠ নেয়, সেখানেই রয়েছে ছবিটি। শুনলে অবাক হতে হয়, ছবি যে শুধু তারই নেই তাই নয়, তার তিন স্ত্রী এবং দুই মেয়ে, চার ছেলে কারোর'ই কোন ছবি নেই। (প্রথমে তার চার স্ত্রী-ই ছিল, তাদের মধ্যে একটি দু'বছর আগেই গত হয়েছেন। তাই মৌলানা সাহেবের বড়ই ইচ্ছা, সে জায়গায় তিনি অতি সত্বর অন্য কোন এক সুশীলা কন্যার পানিগ্রহণ করেন। সেই মতন খোঁজখবরও নাকি চলছে)। এমনকি, তার হাতের স্যামসঙের মোবইলখানিতেও সেই পরিবারের একটি ছবিও আপনি পাবেন না।

''হাদিস অনুযায়ী, ইসলামে মানুষসহ সব ধরণের ছবি তোলাই নিষিদ্ধ বা হারাম,'' সাবলীল ভঙ্গীতে বলে চলেন তিনি। ''ছবি তোলা তো বটেই, এমনকি কোন ছবি আঁকাও ইসলামে বৈধ নয়।'' জানিয়ে দিতে ভোলেন'না মৌলানা সাহেব।

তার মতে, মানুষকে ধ্বংস করতে শয়তান যে অস্ত্র পাঠিয়েছে, তার নামই টিভি বা টেলিভিশন। আর সিনেমা'র কথা তো মুখে যত না আনা যায়, ততো-ই মঙ্গল। ''এর চেয়ে বড় শত্রু আর কি-ই বা হতে পারে?'' গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেন তিনি। ''গান-বাজনা, এমনকি মৃদুস্বরে গুন গুন করে কিছু গাইলেও পরিষ্কার বুঝতে হবে, শরীরের মধ্যে শয়তান ঢুকে পড়েছে।'' এখানেই শেষ নয়, রীতিমত গর্বের সঙ্গে নাসেরে'র দাবী, এই গান গাওয়ার অপরাধেই তার বড় মেয়ে সাবেরা খাতুনকে মেরে তিনি বেশ কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছেন। তখন তার বয়েস আর কতই বা? সাত কি আট! একদিন নাসেরের কানে এল যে, মেয়ে তার বলিউডের কোন এক জনপ্রিয় হিন্দি গান গাইছে। তা শোনার সঙ্গেসঙ্গেই বেধড়ক্কা পিটিয়ে তাকে উচিৎ সহবত শিখিয়েছিলেন নাসের। পাশাপাশি, চিরকালের মত বাড়ির বাইরে বেরুনোও বন্ধ হয়ে গেল ছোট্ট মেয়েটির। কারণ খোঁজ নিয়ে নাসের জানতে পেরেছিলেন যে বাড়ির পাশেই এক পাড়াতুতো চাচার চায়ের দোকানের সামনে খেলতে গিয়েই সাবেরার এই সর্বনাশ! একমুখ তৃপ্তিভরা হাসি হেসে এরপরেই নাসেরের স্বগতোক্তি, আজকাল তো কেবলের (প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত জনবসতি) হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আর কাউকেই এসব গানটান করতেই শুনবেন

না। এখন না কেউ এখানে গান শোনে-না কেউ কিছু বাজায়।"

''অথচ এই একদশক আগেও এখানকার ঘরে ঘরে হরদম গান-বাজনা চলত। পাপী ও টাকফিরে (মুসলমান অথচ যারা শারিয়া আইন মানেন না) ভর্তি ছিল পুরো এলাকাটাই। এরা সিনেমায় যেত, গান শুনতো, অনেকে আবার নাচতোও! মেয়েদের বোরখা পরার বালাই ছিল না, চায়ের দোকানে ছেলেদের সঙ্গে প্রায়ই মেয়েদেরও বসে বসে আড্ডা দিতে দেখা যেত! অসহ্য! 'কেবল' একেবারেই মুশরিকে (যারা মূর্তিপূজার মত মহাপাপ করে) ছেয়ে গিয়েছিল। এক সুফি পীরের মাজারেও নাকি যেত এরা, যা কিনা ইসলামের নজরে ভয়ঙ্কর অন্যায়ই শুধু নয়, হত্যাযোগ্য অপরাধও বটে!" চঞ্চল হয়ে ওঠেন মৌলানা সাহেব।

এক স্ত্রীকে এরপর 'চা' তৈরির ফরমায়েশ করলেন নাসের। অথচ আশ্চর্য্য, প্রত্যুত্তরে রান্নাঘর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সবুজ দুটি চেয়ার, এবং বিছানা লাগানো বসার ঘরটিতেও কোন মহিলাকেই আসতে দেখা গেল না। না এল তার কোন স্ত্রী, অথবা তার মেয়েদের মধ্যে কেউ। কেবলমাত্র কিছু পরে তার দুই ছোট ছেলে বেরিয়ে এসে তাকে 'আদাব' জানালো। নাসের ব্যাখ্যা করে জানালেন সহি ইসলামে ঘরের মেয়েদের যে শুধুই ঘরের বাইরে বের হওয়া বা বহিরাগত কোন পরপুরুষের সামনে আসা বারণ, তাই নয়- এমনকি তাদের কণ্ঠস্বরও সেই সব অপরিচিতের কানে ঢোকা একেবারেই অনুচিত।

এই ফাঁকে ইসলামে 'হারাম' ও 'শিরক' কি বস্তু, তাই নিয়েই মিনিট পাঁচেক ধরে চলল সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। আর সে সবের শাস্তি নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি যখন আমাদের কিছু বোঝাচ্ছেন, এমন সময় বড় বাসন জাতীয় কোন ধাতব পাত্রে হাতা বা খুন্তি জাতীয় কিছু একটা দিয়ে তিনবার মৃদু আঘাতের শব্দ কানে ভেসে এল। পরে বোঝা গেল এটা একটা সংকেত, যা দিয়ে বুঝে নিতে হবে 'চা' তৈরি। অতএব নাসেরের এক ছেলে ভিতরে ঢুকে আমাদের জন্য গ্লাস ভর্তি জল এবং কাপে করে চিনি দেওয়া দুধচা আর সঙ্গে কিছু ভাজা চানা নিয়ে এল। নাসের তার জলের গ্লাসটি তুলে নিয়ে পুরো জলটা শেষ করলেন, কিন্তু একবারে নয়; ঠিক তিনবারে! কারণ, সুন্নাহ (নবী মহাম্মদ তাঁর দৈনন্দিন জীবনে যে যে কাজ ঠিক যে যেভাবে করতেন, তাকেই অবিকল একই উপায়ে যুগযুগ ধরে অনুসরণ করার নীতি) অনুসারে এইভাবেই নাকি জলপানের নিয়ম।

নাসেরের খাবার ধরণটিও ভারি অদ্ভূত। বুড়ো, তর্জনী ও মধ্যমা, কেবলমাত্র এই তিন আঙ্গুলের সাহায্যেই তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। জানা গেল নবীজী যেহেতু এইভাবেই খাদ্যগ্রহণ করতেন, তাই আর সকল মুসলমানেরও ঠিক এইভাবেই খাওয়ার অভ্যাস করা উচিৎ। আমরা যেমন গরম চা-এ চুমুক দেবার আগে তাতে ফুঁ দিই, তিনি কিন্তু একবারের জন্যেও তেমনটি করলেন না। প্রশ্ন করায় উত্তর এল ''যা আপনি খাচ্ছেন, তার গন্ধ শোঁকাও যে ইসলামে নাজায়েজ।" কিন্তু এগুলো মেনে চলার যৌক্তিকতা কোথায়? এর ব্যাখ্যা আর মিলল না তার কাছে। শুধুমাত্র খাবার শেষে ওই তিন আঙ্গুল কেন চেটে পরিষ্কার করতে হবে, সে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তার যুক্তি, ইসলামে এক কণা খাবার নষ্ট করাও গুনাহ।

এবারে আসুন, দেখে নেওয়া যাক এই সালাফির বীজ কিভাবে ভারতবর্ষের বুকে ধীরে ধীরে মহীরূহে পরিণত হয়ে চলেছে।

জন্মসূত্রে নাসের কিন্তু আদপেই কেবল-এর বাসিন্দা নন। কিংবা তার আসল নামও নাসের ছিল না। কথায় কথায় উঠে আসে এক অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর ইতিহাস।

পূর্ব মালদার ছোট্ট ও অখ্যাত গ্রাম্য এলাকা লস্করহাটের এক ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারে তার জন্ম। পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে ছোট। নাম ছিল তার শিমূল, শিমুল খান। শিক্ষাদীক্ষা বিহীন এই নিরন্ন পরিবারেই শিমূলের বেড়ে ওঠা। শিশু বয়সের পাঠও স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতেই। আর এখানেই একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে মাদ্রাসার আলেমদের নজরে পড়ে যান তিনি। আট বছর বয়েসে মালদারই গাজোলে অপর একটি বড়ো মাদ্রাসায় তাকে সরিয়ে আনা হয়। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ইসলামিক বিষয়ে চোস্ত হয়ে ওঠার কারণে মাত্র ১২ বছর বয়েসেই তাকে আরও বড় একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে ভারত বিখ্যাত ইসলামিক হাফেজ (পন্ডিত) মৌলানা হাফিজ মুহাম্মদের কাছে শিক্ষালাভ করতে ভূপাল পাঠানো হয়। পরবর্তী তিনবছর ধরে, সেখানে ইসলামিক সাহিত্য ও দর্শনের উপর চলে তার অক্লান্ত পঠনপাঠন। পরীক্ষায় দেখা যায় অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গেই জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার গণ্ডি অতিক্রম করেছেন নাসের। ফলস্বরূপ এবারে ভারতশ্রেষ্ঠ দেওবন্দ দার-উল উলুমে ঠাঁই মিলে যায় তার। পরবর্তী লক্ষ্য, সেখানে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে ইসলামিক ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ। সেখানেই এক বরিষ্ঠ উলেমা তার নাম পরিবর্তনের বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করেন। ''শিমুল (বাংলার একধরণের উৎকৃষ্ঠ তুলা বিশেষ) নামটি ইসলামিক না হওয়ায় বড়দের কথামত আমি আমার নাম পরিবর্তন করে শেষে 'নাসের'-ই হয়ে গেলাম। আর এটাও

তো ঠিক যে, 'শিমুল' নামটি আদপে একটি হিন্দু নাম-ই বটে, আর কোন হিন্দু বা কাফেরের নামে একজন মুসলমানের নামকরণ কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও এর মধ্যে আমি আমার বাব-মা বা পরিবারের অন্যান্য গুরুজনদের কোন দোষ দেখতে পাই না, তারা তো ছিলেন নেহাতই অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ, বলে চলেন নাসের।

দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে দেওবন্দেও নাসেরের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে সেখানেই তিনি পরিচিত হলেন হজরত মৌলানা পীর মাওদুদির সঙ্গে। মাওদুদির ছিলেন সৌদি আরবের পৃথিবীবিখ্যাত ইসলামিক ইউনিভার্সিটির স্কলার তথা নিঃসন্দেহে এক পিওর সালাফিস্টও (সালাফি প্রচারক) বটে। (সালাফি সম্পর্কে প্রতিবেদনটির অন্তিম অংশে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।)

ঘটনাচক্রে এবারে সেই মাওদুদি-ই স্বয়ং তাকে নিজের কাছে রেখে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশুদ্ধ সালাফি মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। পরিণামে পরবর্তীকালে ''আহল-ই-হাদিস'' নামের সালাফি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন নাসের, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় যা উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বিস্তার লাভ করে আসছিল। এরপরের অধ্যায়টুকু নিয়ে আর বিশেষ মুখ খুলতে চাইলেন না নাসের। অর্থাৎ দেওবন্দ পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কোথায় কোথায় গেলেন, বা কি কি করলেন সেসবের বেশিরভাগটাই তিনি চেপে যেতে চাইলেন বলেই মনে হল। তবে কথাপ্রসঙ্গে এরমধ্যেই একটা সময়ে যে তিনি তবলীগি জামাতের হয়ে দেশজুড়ে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন পরিষ্কার হয় তাও।

অবশেষে বছর সাতেক আগে মালদার কেবলের একটি স্থানীয় মসজিদের মৌলানা হিসেবে নিয়োজিত হন নাসের। শুরু হয় তার কাজ। পাশাপাশি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আরম্ভ হয় এলাকার সমস্ত মুসলমান অভিভাবকেরা যেন তাদের সকল বাচ্চাদের সেখানে পাঠান, তারজন্য সকলকে বোঝানোর কাজটিও। আর সেই থেকেই ক্রমশ বদলে যেতে থাকে কেবলের সামগ্রিক চেহারাটা।

পুরুষেরা অদবকায়দা ও বেশভূষায় তাদের মৌলানাকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। দাড়ি গোঁফে এখন আর তাদের চেনাই দায়। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে শুধু যে কালো বোরখার প্রচলন শুরু হল তাই নয়, তারা পথেঘাটে বেরুনোও বন্ধ করে দিলেন। এমনকি এখানকার পাঁচ বছরের মেয়েদেরও এখন হিজাব পরিয়ে রাখাটাই দস্তুর। এলাকারই গিয়াসুদ্দিন বাবার বিখ্যাত মাজার বা দরগাটিতেও এখন তাদেরকে আর আগের মতন যেতে দেখা যায় না। মুয়াজ্জিনের আজান ছাড়া আর সমস্ত সুর, যা এককালে কেবলের আকাশ বাতাস মাতিয়ে রাখত; সব যেন কেমন নিঝুম হয়ে গেল। আরও মারাত্মক ব্যাপার হল, এখন থেকে এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের তারা এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। সেখানেই শেষ নয়, তাদের সঙ্গে একপ্রকার কথাবার্তা বলা-ই তারা প্রায় বন্ধ করে দিলেন।

বাস্তবে এখানকার এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল, নাসের আসারও বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। ''তখন এখানকার মুসলিমরা আমাদের বেশ বন্ধুই ছিলেন। যথেষ্ট উদার ও ছিলেন তারা। আমাদের পূজা-পার্বণে দিব্যি তারা আমাদের বাড়ি আসতেন, প্রসাদও খেতেন। আমরা হিন্দু-মুসলিম উভয়েই সুন্দরভাবে বাস করতাম, মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করতাম। এরপরই হঠাৎ-ই একদিন গ্রামে কিছু বাইরের মুসলমান এসে হাজির হলেন। তাদের ইয়া বড় বড় দাড়ি, যাদের কাউকেই চিনতাম না আমরা।'' আর এর পরেই বাধল যত গণ্ডগোল।

স্থানীয় মুসলিমদের নিয়ে আড়ালে আবডালে মিটিং করার পাশাপাশি এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইসলাম ধর্মের নামে কি যেন সব প্রচার শুরু করলেন তারা। না জানি কোথা থেকে এলাকার মসজিদ সংস্কারের নামে গ্রামে প্রচুর টাকা ঢুকতে শুরু করল। সেই টাকায় এখানকার মসজিদের পুরো ভোল পাল্টে গেল। নতুন করে সাজানো হল সেটিকে। নয় নয় করে বছর সাতেক হবে, মসজিদে এলেন এক নতুন ইমাম। সেই থেকে এলাকার সবকিছুই যেন খুব দ্রুত বদলে যেতে লাগল। চেনা মুসলমানেরাই যেন হঠাৎ-ই ভীষণ অচেনা হয়ে গেলেন। আজ তারা এতটাই কট্টর যে, আর আমাদের সঙ্গে ভালভাবে কথাটুকু পর্যন্ত বলতে চান না। উল্টে কোথা থেকে ''কাফের-টাফের'' বলে ঘৃণা করেন, যা আমরা সত্যিই আগে কোনদিনই শুনিনি পর্যন্ত। আজ আর তারা আমাদের বাড়িতে আসেন না, এমনকি সেই মৌলানার কথামত তারা হিন্দুদের দেবদেবীর দিকে ভুলেও তাকান না, প্রসাদ খাওয়া তো অনেক দূর। ফলে বর্তমানে আমাদের এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কটা এক চরম অবিশ্বাসের চেহারা নিয়েছে। মনোমালিন্য এমন যায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, আমাদের আর একমুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। কখন যে কি হয়? কে জানে! -এক নিঃশ্বাসে বিষণ্ণবদনে নিজেদের মানসিক যন্ত্রণার ছবিটা ভেতর থেকে নিঙড়ে বার করে আনলেন এলাকারই এক ছোট মুদি দোকানের মালিক কেশব চন্দ্র দাস। বলার সময় তার কণ্ঠে আক্ষেপ ঝরে পড়তে লাগল বার বার। জানা গেল 'কেবল'

এলাকাটি ধীরে ধীরে আজ প্রায় হিন্দুশূন্য। নেহাত উপায় নেই, নইলে সাকুল্যে আর মাত্র ডজন দু'য়েক হিন্দু পরিবার কোনমতে টিকে আছে সেখানে।

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, কেশব যে মৌলানার কথা বলছিলেন, তিনি নাসের ছাড়া আর কেউই নন। এখানে তার পা দেবার দুবছর আগে থেকেই তবলীগি জামাতের প্রচারকেরা মাসের পর মাস ধরে এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সালাফি মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। আর অবাক কান্ড, এলাকাবাসীরাও যেন অতি সহজেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমেই নিজেদের সালাফি মতবাদে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। সহি মুসলমান হবার দৌড়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় তাদের মধ্যে। প্রচুর যাকাৎ (ইসলামিক অনুদান) উঠতে থাকে এলাকা থেকে, আনুমানিক প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন আঙ্গিকে তৈরি করা হয় সেখানকার পুরানো মসজিদটিকে। ঢেলে সাজানো হয় তা। তার পরপরই মসজিদ কমিটির মাথারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের পুরানো ইমামকে সরিয়ে যে জায়গায় মৌলানা নাসেরকে বহাল করেন। সেই শুরু, ক্রমেই পালটে যেতে থাকে কেবলের আশেপাশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সামগ্রিক চালচিত্রটি।

আক্ষরিক অর্থেই তারা যেন হারিয়ে ফেললেন তাদের বর্ণময়তা। পুরুষেরা এবার থেকে কেবলই সাদা পোষাক (যেমন নাসের পরেন) এবং মহিলারা কালো বোরখার অন্তরালে নিজেদের আবদ্ধ করতে শুরু করলেন। দোকানে দোকানে লিপস্টিক বা নেলপালিশ বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। এক এক করে প্রতিটি বাড়ি থেকে সরে গেল সব ছবি। হাতে গোনা যে ক'জনের কাছে টিভি ছিল, তারাও ইসলামিক ধর্মীয় চ্যানেল (যেমনঃ জাকির নায়েকের পিস টিভি) ছাড়া আর সব দেখা বন্ধ করে দিলেন। এমনকি উঠতি বয়েসের ছেলে ছোকড়ারাও মোবাইলে গান শোনা বন্ধ করে দিল, অন্তত প্রকাশ্যে তো বটেই। এলাকার সরকারী স্কুল ছাড়িয়ে বেশিরভাগ অভিভাবকেরাই তাদের শিশুদের নাসেরের মাদ্রাসায় পাঠাতে শুরু করলেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা টিচার নয়, তাদের এখন একটাই স্বপ্ন; কিভাবে বিভিন্ন সালাফি সেমিনারে তাদের ছেলেরা যোগ দিতে পারে, আর মেয়েরা হয়ে উঠতে পারে ঘোর সংসারী।

পরিবর্তনের হাওয়া যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, পেশায় স্থানীয় ব্যবসায়ী নবাব বিশ্বাসের কথাতেই তা পরিষ্কার। একটা সময় সিনেমাপাগল এই লোকটি ছিলেন অন্ধ শাহরুখ ভক্ত। উৎসব-পার্বণে কখনো সখনো দু'এক ঢোঁক পানেরও অভ্যাস ছিল তার, আর এইসব হালাল টালালের সে ধার ধরতেন না কখনো। তার বড় মেয়ে'তো (২৬) রীতিমত জিন্‌স পরেই রাস্তাঘাটে চলাফেরা করত। এমনকি বছর কয়েক আগে নিজের পছন্দেরই এক ছেলেকে বিয়েও করে সে। আর আজ? এককালে যে নবাব মনেপ্রাণে চাইতেন যে তার ছেলেরা (২৪,২২) ডাক্তার বা পুলিশ অফিসার হোক, আর আজ বড় ইচ্ছে, যদি তারা একবার নাসেরের মতই সালাফি প্রচারক হতে পারে। আল্লাহের কাছে তার এখন শুধু একটাই প্রার্থনা, বড়টি যেন সৌদির মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ইসলাম নিয়ে পড়ার সুযোগ পায়, একমাত্র যেখানেই যে সহি মুসলিম বা ওয়াহবি'জমের সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তার স্ত্রী রুকসানা একটা সময় শাড়িই পরতেন, পরিবারের সঙ্গে ঘুরতেও যেতেন ছুটির মরসুমে। এই বাংলার পাহাড় থেকে সমুদ্র বহু জায়গায় তোলা সে সব ছবি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন শোবার ঘরে। আর এখন এই ঘরই তার সব। ছ'মাসে ন'মাসে কদাচিৎ কোন কারণে যদি বা তাকে ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা মাড়াতে হয়, কালো বোরখাই তার একমাত্র সম্বল। আর বেড়াতে যাওয়া? সে যে স্বপ্নেরও অতীত। সুমী (১৯) ছিল তাদের আদরের ছোট মেয়ে। সে ছিল নবাবের চোখের মণি। একটা সময় তার খুব ইচ্ছে ছিল, মেয়ে হবে তার বিরাট বড় স্কুলমাস্টার; অনেক পড়াশুনা করবে, বাচ্চাদের পড়াবে। অথচ দেখা গেল, গতবছরেই পাশের জেলা মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের বছর পঁয়ত্রিশের এক মৌলভীর সঙ্গে তার নিকা করিয়েছেন তিনি। একটি সন্তানের পর সে এখন পুনরায় সন্তানসম্ভবা।

''এখন বুঝি, একটা সময় আমরা কেমন মুশরিকের (মুসলিম হয়েও কাফেরের জীবনযাপন) জীবন কাটিয়েছি। না বুঝে, কত অধর্ম আর পাপ-ই না করেছি! শুধু নামেই আমরা মুসলিম ছিলাম। ওটুকুই ব্যাস! উনি (মৌলানা নাসের) না এলে যে কি হত!! উনিই তো আমাদের চোখ খুলে দিলেন। না হলে ইসলাম কি, আমরা কি জানতে পারতাম? নাসেরই আমাদের বাঁচিয়েছেন। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'' বলিষ্ঠ গড়নের নবাবে'র অন্তঃস্থল থেকে অকপটে বেরিয়ে আসে এই অভিব্যক্তি। তবলীগি জামাতের শিক্ষায় মুখভরা দাড়ি শোভিত একজন সালাফি প্রচারক হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করতে আজ যিনি বড়ই ব্যকুল।

''জীবনে বহু পাপ করেছি, তাই আমার কাছে আজ একটাই রাস্তা সালাফি প্রচার। আমায় মালদা বা তার আশেপাশের মুসলিম ভাইদের মাঝে ইসলামিক সালাফি আদর্শ প্রচার করতে

হবে। তাছাড়াও মনে প্রাণে এও চাই যে, যতবেশি পারি কাফের'দের (অমুসলিম) তাদের নরকের রাস্তা থেকে উদ্ধার করে ইসলামের আলোকিত পথে নিয়ে আসি। ইনশাল্লাহ, ভারত একদিন মুসলিম দেশ হয়ে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবেই। মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ এশিয়া এই পুরো অঞ্চলটাতেই একদিন ইসলামিক খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সে দিনটা খুব বেশি দূরেও নয়! তখন হাদিস অনুযায়ী, হাতে গোনা নির্দিষ্ট কয়েকটি ছাড় বাদে এখানকার কাফেরদের আর টিকে থাকাই মুশকিল। তাই আগেভাগেই তাদের মুসলমান হয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এটাই যে আল্লার ইচ্ছে"। স্থির দৃষ্টিতে এক নিঃশ্বাসে বলে চলেন নবাব। অবশ্য এ সবই তার মৌলানা নাসেরের কাছ থেকেই শেখা। আর এটাও ঠিক যে, নাসেরও তার সালাফি কট্টরতার ব্যাপারে পুরোপুরি খোল্লামখুল্লা। প্রকাশ্যে মুন্ডচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, পাপী-পরকীয়াকারী ও কাফেরদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা-এসবকিছুকেই তিনি প্রবলভাবে সমর্থন করেন। তার মতে, ইসলামিক উম্মাহ (বিশ্বব্যাপী কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ) প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা তথা ইসলামের বিস্তার ঘটিয়ে (প্রয়োজনে বলপূর্বক হলেও) সারা বিশ্বে ইসলামিক খিলাফতের (সাম্রাজ্য) জন্যে পবিত্র জেহাদ, প্রতিটি সহি মুসলমানের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। তাইতো নাসের আইসিস'কে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আমেরিকাকে মনে করেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জালেম (শয়তান)। তার আরও বক্তব্য, এদেশের কোন মুসলমানেরই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান কার উচিৎ নয়, কারণ তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর। তার মতে পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ায় বাংলাদেশ তাদের সুমহান ধর্মীয় ঐতিহ্য হারিয়েছে, আর তাইতো সে দেশে এখন এত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ''আল্লার গজবের মূল্য তো তাদের চোকাতেই হবে, পুড়তে হবে জাহান্নামের অনন্ত আগুনে।" রেগে ওঠেন নাসের।

''এমন একটা দিন ছিল, যখন প্রায় সারা পৃথিবীটাই ইসলামের ছায়াতলে ছিল, -ইনশাল্লাহ সেই সোনালী দিন আবার ফিরে আসতে চলেছে। চারিদিকে মুসলমান দেশগুলির মাঝে এই এক ভারতই কেবল ইসলামিক নয়। তবে এও আর খুব বেশিদিন চলবে না, দেখবেন ভারতও একদিন সেই ইসলামিক রাজ্যে গিয়েই নাম লেখাবে। আর এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র"। এবারে বেশ তৃপ্তির হাসি হেসেই কথাগুলো বলছিলেন নাসের। সঙ্গে আরও যোগ করলেন, ''প্রচুর সংখ্যায় মুসলমানের কারণে পূর্বভারত ইতিমধ্যেই সেই পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আর সে জন্য এ অঞ্চলের গত কয়েকদশকে মুসলিম বৃদ্ধির হারকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।"

''একমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলেই ভারতের সব সংকটের অবসান সম্ভব। ইনশাল্লাহ একবার যদি তাই হয়, তবে ভাবতে পারছেন আমাদের লাভ ঠিক কতটা? দেখবেন পাকিস্তানের সঙ্গে সব শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে। মিলিটারি পোষার কোটি কোটি ডলারও আর খরচ করতে হবে না। আর সত্যি বলতে কি, তাহলে তো আমাদের আর্মিরই আর কোন দরকার পড়বে না। চারিদিকে তখন শুধুই মুসলমান, সবাই আমাদের বন্ধু হয়ে যাবে। আল্লা তখন আমাদের ইসলামিক ভারতকে বুক দিয়ে রক্ষা করবেন।" এবারে নাসেরকে সত্যিই যেন বেশ সিরিয়াস দেখায়।

এখন কথা হল, দেশের মধ্যে 'কেবল'-এর মত স্থান কি শুধু এই একটাই?

সত্যি বলতে, এই বিপদটা কিন্তু আজ আর ঠিক মালদার 'কেবলে'ই আটকে নেই, বরং তা সংক্রমিত হয়ে পড়েছে সারা দেশের সর্বত্র। সৌদি ওয়াহবিজমের তীব্র বিষে বিষাক্ত এমন হাজার হাজার 'কেবল' বর্তমানে সারা ভারত জুড়েই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে সৌদি আরবের বেআইনি পেট্রোডলারের বদান্যতায় আজকের দিনে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিভিন্ন জায়গায় মৌলানা নাসেরের মতনই এমন হাজার হাজার খারিজি মাদ্রাসা ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র গজিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। অহর্নিশি সেখানে প্রকাশ্যে ইসলামিক সালাফি মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে। প্রচারকরা প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত থেকে সেসব জায়গায় দিনরাত ধরে পুরোদমে তাদের কাজ (প্রচার) চালিয়ে যাচ্ছেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, বাংলা ও আসামের মুসলমানদের বেশ বিরাট অঙ্কের একটা অংশ আজ ইতিমধ্যেই এই রাস্তায় সালাফির আদর্শে জীবন পণ করার ব্রত গ্রহণ করেছেন। অথচ ভোটের লোভে এসব বিষয়ে রাজনীতিবিদেরা নীরব। আর তাদের চাপে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসনও।

সালাফি ইসলামের কালো মেঘ যে ধীরে ধীরে আমাদের ভাগ্যাকাশ ছেয়ে যাচ্ছে, সকলের কাছেই তা আজ জলের মত পরিষ্কার। দিকে দিকে রাস্তাঘাটের সর্বত্র বোরখা ঢাকা মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুরুষদের মধ্যে দাড়ি রাখার চল ও দীর্ঘ কুর্তা সহ খাটো পাজামা পরার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। সালাফি ভাবধারার মসজিদের সংখ্যাবৃদ্ধির পাশাপাশি এই ধরণের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াবার জন্য মুসলিম মহল্লাগুলিতে নিরলস প্রয়াস চালাতে দলে দলে ময়দানে নেমে পড়েছেন

মৌলভী-ইমামদের একাংশ। এছাড়াও মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও ইদানীং বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন হামেশাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুসলিমদের মধ্যে বিরাট একটা অংশই আজ আর গান-বাজনার ছায়াও মাড়ান না। নাচ-গান, ছবি তোলা বা ছবি আঁকার মত সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের প্রায় সবকিছুতেই দাঁড়ি টেনেছেন তারা। এক এক করে মুসলিম অভিভাবকেরা তাদের শিশুদের সরকারী স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে সালাফি মাদ্রাসাগুলির লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি প্রতিবেশী হিন্দু-সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ক্রমেই পারস্পরিক কথাবার্তাও বন্ধ করে দিচ্ছেন তারা। বাড়িয়ে তুলছেন আভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ ও অবিশ্বাসের বিষবাস্প। সবচেয়ে বড় কথা, সালাফি তথা তবলীগি জামাতের প্রচারকেরা নিঃশব্দ ও চুপিসাড়ে হিন্দু, বিশেষ করে তাদের দলিত ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অংশকে বেশকিছু ক্ষেত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে চলেছেন। এই ধরণের ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনা কোন প্রচারের আলোয় আসে না, বা সদ্য ধর্মান্তরিতেরাও তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনিক স্তরে কিছু না জানানোয় তাই নিয়ে কোন খোঁজখবর হয় না বা হৈচৈ-ও পড়ে না। আরও মারাত্মক বিষয় হল, এইসব এলাকারই একশ্রেণীর ধর্মান্ধ যুবক বেশ বড় সংখ্যায় আজকাল বিভিন্ন ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

ভারতীয় মুসলিম সমাজের এই মারাত্মক ছোঁয়াচে অসুখের খবর ''র'' সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নজরে ইতিমধ্যেই এসেছে। এ বিষয়ে তারাও তাদের আভ্যন্তরীণ তদন্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে বেশ করেছেন। ফলস্বরূপ সৌদি আরব-সহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলি থেকে নিয়মিত ভারতের বুকে ইসলামিক সালাফি প্রচারের জন্য বেআইনি পথে যে প্রচুর পেট্রোডলার ঢোকে সেগুলো নিয়ে ছানবিন শুরু হয়েছে। অতি সম্প্রতি মোদিজীর নোটবন্দির খেলায় ওই টাকার অনেকটাই নষ্ট হয়েছে । একইসাথে আহল-ই-হাদিস বা তবলীগি জামাত-সহ সমস্ত সন্দেহজনক সালাফি ইমাম ও মৌলানাদের কড়া নজরদারির আওতায় আনার কাজ চলেছে। প্রচারের গণ্ডির বাইরে অত্যন্ত চুপিচুপি ছেঁটে ফেলা হচ্ছে এইসব দেশবিরোধী মাদ্রাসা ও সভাসমিতির আর্থিক সংস্থান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদন্তকারী সংস্থাগুলি সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সামগ্রিকভাবে এর কোনকিছুই যথেষ্ট নয়।

রাষ্ট্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এই ধরণের সমস্ত সালাফিস্টদের তদন্তসাপেক্ষ অবিলম্বে গ্রেফতারপূর্বক পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরার পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ এনে নিশ্ছিদ্র চার্জশিট পেশের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা উচিৎ। এছাড়াও এই ভয়াবহ সামাজিক বিষ সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরেই ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বৃহত্তর সরকারী উদ্যোগ ও সদিচ্ছারও প্রয়োজন।

কিন্তু এখন এই ঝুলি থেকে বেরুনো বিড়ালের গলায় ঘন্টাটি বাঁধে কে??

'সালাফি' বিষয়টা আসলে কি?

'সালাফি' নামের ইসলামের ভয়ঙ্কর রকমের গোঁড়া ও পশ্চাদপদ এই রূপটি এসেছে 'সালাফ' নামের আরবি শব্দটি থেকে, যার অর্থ 'ভক্তিমান পুর্বপুরুষ'। সালাফিস্টরা সর্বদাই প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পুর্বপুরুষদের মতই ধর্মের ব্যাপারে মারাত্মক আচারনিষ্ঠ তথা সমকক্ষ হবার চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে স্বয়ং নবী মহাম্মদ এবং তার সমসাময়িক পার্শ্বচরবৃন্দই (আল-সালাফ আল-সালিহ বা তাদের পুণ্যাত্মা পুর্বপুরুষেরাই) হলেন তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। একটি হাদিস (যেখানে নবীর প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মাদির বর্ণনা আছে) মতে, যেখানে মহাম্মদ বলেছেন যে তার সমসাময়িক ও পরবর্তী দুটি প্রজন্ম অর্থাৎ নবীর সময় থেকে কেবলমাত্র পরবর্তী তিন প্রজন্মের অনুসারীরাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, আর এই হাদিসটিই হল সালাফিস্টদের এহেন অনুপ্রেরণার উৎসবিন্দু। আর হজরত উল্লেখিত উক্ত তিন প্রজন্মের শিষ্যরাই সামগ্রিকভাবে 'সালাফ' নামে সম্মানিত।

সালাফি ইসলামের প্রবক্তা হিসেবে যার নাম সর্বপ্রথম উঠে আসে, তিনি হলেন তাকি আদ-দ্বীন আহমেদ ইবন তায়মিয়া (১২৬২-১৩২৮ খ্রীঃ), যিনি আরবের বাইরের মুসলমানেদের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলেই মনে করতেন। ১৩০৩ খ্রীঃ প্রচারিত একটি ফতোয়ার মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলিম মাত্রেরই 'মঙ্গোল'দের হত্যা বাধ্যতামূলক এই মর্মে একটি নির্দেশ জারিও করেন তিনি, যদিও পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সেটি শারিয়া'র পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন পবিত্র জিহাদের মাধ্যমে কাফের নিধন প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। ১২৯৩'এ আসফ-আল-নাসরানি নামক এক খ্রীষ্টান যাজকে'র বিরুদ্ধে আহমেদ প্রথম মৃত্যুদন্ডের ফতোয়া জারি করেন। নাসরানির অপরাধ, তিনি নাকি মহম্মদ সম্পর্কে কটুক্তি করেছিলেন। আজও ইসলামিক কট্টরপন্থীরা অমুসলিম কাফের, যাদের তারা শত্রু বলে গণ্য করে; হত্যা করতে উক্ত ফতোয়াদ্বয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

আহমেদ এবং তার অনুসারীরা দামাস্কাসের বুকে মূলত ''ধর্মীয় পুলিশ'' পরিচয়ে সকলের উপরেই নজরদারী চালাতেন। রাস্তার পাশের সরাইখানা থেকে শুরু করে মদের দোকান, সর্বত্র তারা তল্লাশী অভিযান চালাতেন। নির্মম ভাবে হত্যা করতেন নাস্তিকদের। সুফি শেখেদেরও সেখানে নিস্তার ছিল না। তার নেতৃত্বে আলওয়াতিস (প্রাথমিক ইসলামিক কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধাচারণকারী উদারচেতা মুসলিমগণ) সহ শিয়া, সুফি এবং অ-সালাফিগণকে ইসলামের মাটি থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে তাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সামরিক অভিযানও চালানো হয় বলে জানা যায়। মুসলমানেদের মধ্যে যে বা যারা দরগায় তীর্থ করতে যান, ইসলামের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে চান, (বিদাহ, যা ইসলামে অবৈধ বা হারাম), শিরক্বের (মূর্তিপূজা) ন্যায় মহাপাপে লিপ্ত বা সর্বোপরি কোন সুফি বা ওয়ালির মাজারে গিয়ে হত্যে দেন, তাদের সকলকেই আহমেদ কাফের বলে তিরস্কার করেন। মুসলিম দেশগুলিতে শারিয়া আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সালাফিস্টরাই সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বহুত্ববাদী সংস্কৃতি তথা তাওয়াশুল ওরফে আল্লা ভিন্ন অন্য কারও প্রতি সামান্য আস্থারও এরা তীব্র বিরোধী। তাদের ধারণা অনুযায়ী, যুক্তি তর্কের আলোকে ইসলামিক মত-খণ্ডন (আল-কালাম) পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম। শুধু কি তাই? পরিস্থিতি বিশেষে কখনও কখনও ইসলামের প্রচলিত মতবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপনার জন্য মূর্তাদদের (ইসলাম ত্যাগী) হত্যা পর্যন্ত করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই আধুনিক বিশ্বে এই সালাফি মতাদর্শের ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন বিশিষ্ট ইসলামিক ধর্মগুরু মহাম্মদ ইবন আব্দ আল-ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২)। ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেন। সৌদি আরবের অখ্যাত অঞ্চল নাজদ থেকেই প্রাচীন ইসলামিক ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার তার সে মহান শুদ্ধিকরণের কাজ শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে পীর-ফকিরদের পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রায়ই মাজারে গিয়ে উপস্থিত হবার চল ছিল। তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তার মতে, এসবই ছিল মূর্তিপূজার (বুতপরস্তি) অঙ্গ মাত্র। আহমেদ ইবন তায়মিয়াকেই তিনি তার জীবনের ধ্রুবতারা রূপে চিহ্নিত করেন।

সালাফি মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের বিষয়ে ১৭৪৪'এ দিরিয়ার (বর্তমানের রিয়াধ) আমীর (প্রধান শাসনকর্তা), মুহাম্মদ বিন সৌদ-এর সঙ্গে ওয়াহবের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার শর্তানুসারে ওয়াহাব সর্বদাই আমীরের পাশে থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। শেষে ওয়াহাবের মেয়ের সঙ্গে সৌদের ছেলে আব্দুল আজিজের বিবাহের বিনিময়ে চুক্তিটির পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। আর সেই থেকেই পাকাপাকিভাবে সৌদি আরবের ধর্মীয় বিষয়ক মন্ত্রকটিতে ওয়াহবের বংশধরদের (যারা আল আশ-শেখ নামে বিখ্যাত) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ওয়াহাবের সাহায্য নিয়ে এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৌদি আমীর পার্শ্ববর্তী বিরাট অঞ্চলে তার ক্ষমতা বিস্তার করেন।

১৭৪৪-এর এই বিখ্যাত চুক্তিটিই ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির সার্থক ব্যবহার, আজকের দিনে পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসকেরা প্রায়ই যার অনুসরণ করে থাকেন। সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ মদতে ওয়াহাবি প্রবর্তিত সুন্নি ইসলামের যে ভয়ঙ্কর কট্টরপন্থী তথা চূড়ান্ত মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিদর্শন প্রতিমুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র চলেছে, তাই ''সালাফি ইসলাম''। বিশ্বব্যাপী সর্বত্র এই সংক্রমণের কাজে ইন্ধন যোগাতে সৌদি সরকার আজ কোটি কোটি ডলার খরচ করছেন।

নিজের শহর উয়াইয়ানার বুকে হজরত মোহাম্মদের সাক্ষাৎ পার্শ্বচর (সাহাবা) জায়েদ ইবন-আল-খাত্তাবের স্মৃতিসৌধ ধ্বংসের পাশাপাশি অবৈধ সম্পর্কের জেরে এক মহিলাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার মধ্যে দিয়ে আরবের মাটিতে প্রথম ওয়াহাবের ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ যজ্ঞ শুরু হয়।

সৌদের মৃত্যুর পর তার পুত্র তথা ওয়াহাবের জামাতা আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মদও ওয়াহাবি মতাদর্শের এক একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তার সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সরাসরি আহমেদ ইবন তায়মিয়া প্রবর্তিত ''হয় ধর্মান্তকরণ - নয় মৃত্যু'' নীতি অবলম্বন করে 'টাকফির' প্রথার সূত্রপাত ঘটান। এই মারাত্মক প্রথানুযায়ী 'সালাফি নয়' এমন মুসলমানেদের দিকে দিকে কাফের বা অমুসলমান হিসেবে ঘোষণা করে শিশু ও নারী-পুরুষ সহ নির্বিচারে দলে দলে নির্মমভাবে হত্যা করা হতে থাকে। ১৮০২ খ্রীঃ আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাবাহিনী পবিত্র শহর 'কারবালা' আক্রমণ করে তা কব্জা করে নেয়। এই অভিযানে প্রায় পাঁচ হাজার শিয়া নিহত হন। লুঠ করা হয় মোহাম্মদের নাতি হুসেইন ইবন আলীর পবিত্র দরগা। এছাড়াও এলাকার সমস্ত শিয়াদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে তাদের দাসী বানিয়ে তুলে আনা হয়।

১৯০১-এ বর্তমান সৌদি আরবের রূপকার, আব্দুল

আজিজ নামে সৌদের অপর এক বংশধরের (পঞ্চম প্রজন্ম) আমলে সৌদি আরবের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দুর্বল এবং অ-সালাফি মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদের ধ্বংস করা হয়। ওয়াহাবের সালাফি ইসলামের ছত্রতলে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার এই ভয়াবহ কর্মকান্ডের চিহ্নস্বরূপ মাত্র দুই বছরের মধ্যেই সেখানে অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষকে প্রকাশ্যে জবাই করে হত্যা (কোতল) করা সহ সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি অঙ্গচ্ছেদন সম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে সালাফি ইসলাম বিস্তারের লক্ষ্যে ১৯৬১-তে সৌদি আরবের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় কুখ্যাত 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ্ মদিনা'। সারা পৃথিবী থেকে এখানে মুসলিম ছাত্রেরা সালাফির পাঠ নিতে আসেন। জানলে অবাক হতে হয় যে, এ বছরেও ভারত থেকে এখানে আসা ছাত্রের সংখ্যা ১৬। এছাড়াও পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে পাকিস্তানের ৪১ জন ও বাংলাদেশের ২২ জন সেখানে সালাফির শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন। ১৯৬২তে এই ইউনিভার্সিটিতেই জন্ম লাভ করে, 'ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ' নামক অপর একটি ইসলামিক শাখা সংগঠন। সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলামিক সালাফি ভাবধারা প্রচারের পাশাপাশি এদের অপর একটি বড় কাজ হল ইসলামিক দেশগুলিতে সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালানো। এছাড়াও দেশে দেশে মুসলিম ব্রাদারহুড, আহল-ই-হাদিস, জামাত-ই-ইসলামের মত বিভিন্ন চরমপন্থী ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলির অনৈতিক কাজকর্মে তারা সর্বপ্রকারে প্রভূত সাহায্য করে থাকে।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, এহেন ভয়ঙ্কর ইসলামিক সালাফিজম প্রচারের উদ্দেশ্যে ২০১১ থেকে ২০১৩ বিগত দু'বছরের মধ্যে অন্তত প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি সালাফি ধর্মপ্রচারক আমাদের দেশে প্রবেশ করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গোপন সভা-সমিতি ও সেমিনারের মাধ্যমে উল্লেখিত সালাফি ভাবধারাকে সারা ভারত জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে কমপক্ষে সতেরেশো কোটি টাকার এক বিরাট অঙ্কের প্যাকেজও তাদের সঙ্গেই এখানে ঢুকেছে বলে সূত্রের খবর। এরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় মুসলমানেদের কি কি করা কর্তব্য নয়, তার উপরে বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা বন্টনের দ্বারা দিকে দিকে নির্দেশ পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছেন। সেই ফর্দে কিছু কি আর বাকি আছে? মেয়েদের জন্য বোরখা বাধ্যতামূলক করা থেকে শুরু করে পুরুষদের জন্য গালভরা দাড়ি, নারী পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশায় লাগাম পরানো, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের সময় চোখের জল না ফেলা থাকা, অট্টহাস্য না করা, নাচ-গান থেকে শতহাত দূরে থাকা, এমনই তুঘলকি শর্ত আরও কত কি! এমনকি বন্ধ টিভি দেখা।

পরিশেষে এও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিৎ যে, সিরিয়ার আইসিস থেকে আফগানিস্থান-পাকিস্তানের আলকায়দা, তালিবান, জৈস-ই-মুহাম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা কিংবা জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ-এর মত মানবতাবিরোধী প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠনই এই সালাফি ইসলামকেই তাদের মূলমন্ত্র মেনে চলে।

অতএব, শিয়রে শমন। ভারত কি পারবে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে?

তথ্যসূত্র ঃ স্বরাজ পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক শ্রী জয়দীপ মজুমদারের প্রতিবেদন অবলম্বনে অনুলিখিত।

কাণ্ডজ্ঞানহীন পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা গোটা দেশকে বিভ্রান্ত করে। সর্বনাশ আড়াল করতে চায়, হিন্দু বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে। কোরান না পড়ে ইসলামকে না জেনে অকারণে তার প্রশংসা করে। কোরানে ঠিক কি আছে তা নিয়ে কোন বিদগ্ধ লেখক কোনদিন আলোচনা করেন না। কেন করে না? এঁরা সকলেই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে। 'আনন্দবাজার', 'আজকাল' অকারণে গরু খাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে। বিপক্ষে চিঠি লিখলে ছাপে না। গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে হিন্দুদের ছোট করে দেখানো লেখক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশন। প্রগতিশীল হবার তীব্র ইচ্ছা এদের বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছে। এরা জানে না ইসলামে গরু কাটার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

—শিবপ্রসাদ রায়

হিন্দু গণহত্যার ইতিহাস এক ঝলকে

দিব্যেন্দু সাহা

এখনো পর্যন্ত প্রায় ৪০ কোটি হিন্দুর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ইসলামের তলোয়ারের দ্বারা। বর্বর আরব জাতির ইসলামের সমর্থকেরা ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই মেতে উঠেছে 'কাফের' হিন্দুদের গর্দান নামিয়ে দেওয়ার খেলায়। পেট্রোডলারের দাসত্ববৃত্তিকারীরা অনেক চেষ্টা করেও শেষমেশ ৮ কোটি হিন্দুর গণহত্যার কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাহলেও সেই গণহত্যাগুলিকে 'অসাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিতে তারা সদা সচেষ্ট। কিন্তু বাস্তব এটাই যে, 'কাফের' হিন্দুদের হত্যা করে তাঁদের মহিলাদের ধর্ষণ ও মন্দিরগুলি ধ্বংস করে সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবতাদের মূর্তি দিয়ে মসজিদের সিঁড়ি (যাতে সেগুলি পায়ে মাড়িয়ে চরম শাস্তি পায় বিশ্বাসী মুসলমানেরা) বানানোর খেলায় সর্বদাই মেতে থাকত মুঘল-সুলতানি বর্বরেরা। আসুন, এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক - সেই রক্তে ভারতভূমির মাটি কর্দমাক্ত হওয়ার ঘটনাক্রম।

১) মথুরার গণহত্যা ঃ ১০১৮ সালে মহাওয়ান জেলায় প্রায় ৫০,০০০ হিন্দুদের জলে ডুবিয়ে ও তলোয়ারের কোনে হত্যা করা হয়। সেইসঙ্গে হয় সেই জেলার ১,০০০ হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসসাধন।

২) সোমনাথ মন্দিরের গণহত্যা ঃ ১০২৪ সালে গুজরাটের প্রভাস পাটনে ৫০,০০০-এর বেশি হিন্দু হত্যার পর বর্বর মেহমুদ গজনী লুট করে ধ্বংস করে সোমনাথ মন্দিরকে।

৩) ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ও ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে আজমেঢ় ও গোয়ালিয়র দুর্গে মোট ২ লাখ হিন্দুহত্যা হয়। প্রথমটির তত্ত্বাবধায়ক ছিল মেহমুদ ঘোরী ও দ্বিতীয়টির নায়ক ছিল কুতুবউদ্দিন আইবক নামক নরপশু।

৪) ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দা জেলায় (বিহার) প্রায় ১০, ০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করে বখতিয়ার খিলজি।

৫) এক কিছুকাল পর ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নেওয়াতের প্রায় সব রাজপুতদের (সংখ্যায় ১লাখ) নিধনযজ্ঞ সাধিত হয় গিয়াসুদ্দিন বলবন নামক উন্মত্ত জেহাদীর রক্তপিপাসা শান্ত করার জন্য।

৬) ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২,০০০ নিরীহ হিন্দুর রক্তে প্লাবিত হয় পান্ড্যরাজ বংশের রঙ্গনাথস্বামী মন্দির (শ্রীরঙ্গম) ১২, ০০০ প্রার্থণারত হিন্দুদের জবাই করে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের বর্বর সেনাবাহিনী। একই কায়দায় আজও চলছে অমরনাথ যাত্রীদের হত্যালীলা।

৭) ১৩৫৩ সালে বাংলার ১,৮০,০০০ হিন্দুদের শিরচ্ছেদের ফিরোজ শাহ তুঘলক তার পশুসম সেনাদের পুরস্কৃত করে।

৮) ১৩৬৬ সালে বিজয়নগরের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ঘটে এক বিভৎস হিন্দুমেধ যজ্ঞ। ৫,০০,০০০ হিন্দু হত্যা হয় বাহমনীর মুসলিম সেনাবাহিনী দ্বারা। শুধু রায়চূড় ছোয়াবেই ৭০,০০০ হিন্দুর (সব বয়সের) হত্যা হয়। রেহাই পাননি গর্ভবতী হিন্দু মহিলারাও। সেই জেলাগুলি পরিণত হয ধ্বংসস্তূপে।

৯) ১৩৯৮ সালে হরিয়ানায় তিমুরের হিংস্র, বর্বর ও উন্মত্ত নরপশুসম সেনা প্রায় ৪৫ লাখ হিন্দুর শিরচ্ছেদ করে। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও ওই কথা খাঁটি সত্য। তিমুর নামক নরপশুর নিজেরই বয়ান অনুযায়ী তার প্রত্যেক সেনা অন্ততঃ ৫০ থেকে ১০০ হিন্দু হত্যা করেছিল। তাহলে, তার ৯০,০০০ লোকের/ নরপশুর সেনাবাহিনী অন্ততঃ যে ৪৫ লাখ হিন্দু হত্যা করেছিল, সেকথা জলের মতো স্পষ্ট। সত্যিই, বাস্তব বড় রূঢ়। ১৩৯৮-এই তিমুর নামক নরপশু ভাটনের দুর্গের সব হিন্দুদের হত্যা করে। ঐ সালের ডিসেম্বরে গাজিয়াবাদের লোনিতে প্রায় ১লাখ হিন্দু মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে হত্যা করে এই একই নরপশু।

১৩৯৮ সালে দিল্লির প্রায় দেড় লাখেরও বেশি হিন্দুর গণহত্যা হয় তিমুরের হাতে। এই নর সংহার ও হিন্দুরক্ত দিয়ে হোলি খেলার পর তিমুর নামক নরপশু আনন্দ করে বলে, ''মুসলিম সৈয়দ, উলেমা ও মুসলিম জনগণ ছাড়া পুরো শহরকে আমি ছারখার করেছিলাম।'' হিন্দু মৃতদেহের খুলি দিয়ে পিরামিড বানানো হয় তারপর দিল্লিতে। বাকি জীবিত হিন্দুদের দাস বানিয়ে নেওয়া হয়। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মীরাটে ৩লাখ হিন্দুর রক্তবন্যা হয় তিমুরের সেনাদের হাতে। কারণ কি ছিল জানেন? তিমুরের সেনারা হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করতে চাইলে স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিবাদ করেন। 'গণিমতের মাল'-দের ধর্ষণের প্রতিবাদ? 'কাফের'-দের এতো সাহস?

১০) ১৫২৭ -এর মার্চে উদয়পুর রাজ্যের খানুয়ায় ২লাখ হিন্দুর গণহত্যা হয় এর মধ্যে ১লাখ রাজপুত বীরেরা ছাড়াও ছিলেন নিরীহ হিন্দুরাও। এই হত্যালীলার নায়ক-'বর্বর বাবর'। এরপর ১৫৬০-এ হয় গরহা-কাটাঙ্গা রাজ্যের ৪৮,০০০ হিন্দু চাষীর গণহত্যা। হত্যাকরী আর কেউ না। আমাদের 'সেকু' বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত প্রিয় আকবর।

১১) ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর প্রত্যক্ষ করে ১লাখেরও বেশি হিন্দুর রক্তবন্যা। সুলতানি সেনারা এই সময়েই করে সেই শহরের অপূর্ব ভাস্করমন্ডিত মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন। ১৫৬৮-র ফেব্রুয়ারীতে উদয়পুর রাজ্যের চিতোর দুর্গে আকবরের নির্দেশে ৩০,০০০ হিন্দুর হত্যা হয়। ৮,০০০ রাজপুত রমনী জেহাদী পশুদের থেকে নিজেদের দেহরক্ষার জন্য 'জহরব্রত' পালন করে ঝাঁপ দেন আগুনে। আর আজ কিনা হিন্দু বালিকারা পড়ছে 'লাভ জিহাদ'-এর খপ্পরে? ছি ছি! কি হল আমাদের সংস্কৃতির?

১২) (১৬৬৮-১৭০৭) সালের মধ্যে সংঘটিত আজ পর্যন্ত হওয়া সমস্ত গণহত্যার সবচেয়ে কালো অধ্যায়। আমাদের এই ভারতভূমিতে। প্রায় ৪৬ লাখ হিন্দুর হত্যা হয় নরপশু ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে।

এমনই এক ঘটনা হিন্দুগণ হত্যা হয় বারানসীতে। সেখানে প্রায় ১,৫০,০০০ ব্রাহ্মণের নৃশংসভাবে হত্যা করার পর ঔরঙ্গজেব গঙ্গা ঘাট ও হরিদ্বারে হিন্দু ব্রাহ্মণের খুলি দিয়ে তৈরি করে পাহাড় যা দেখা যেত ১০ মাইল দূর থেকেও!

সত্যি, জানোয়ারেও যা করে না, ইসলামী জেহাদীরা তাও হাসতে হাসতে করে।

১৩) (১৭৩৮- ১৭৪০) সালে উত্তর ভারতে পারস্যের হামলাকারীরা ৩ লাখের মতো হিন্দুর রক্তের হোলী খেলায় মেতে উঠেছিল।

১৪) লাহোরের কাছে ১৭৪৬-এ শিখদের দিতে হয়েছিল অমুসলিম হওয়ার মূল্য। প্রায় ৭,০০০ শিখদের হত্যা হয়েছিল জেহাদীদের হাতে। ১৭৬৩-তে পাঞ্জাবে প্রায় ৩০,০০০ শিখদের মেরে আফগান মুসলিম জেহাদীরা শিখ জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশই নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

১৫) ১৭৬১ সালে পানিপথের যুদ্ধে প্রায় ৭০,০০০ মারাঠী পুরুষ ও ২২,০০০ মারাঠী মহিলা ও শিশুদের দাস বানানো হয়। আফগান মুসলিমরা বড্ড মজা পেয়েছিল এত 'গণিমতের মাল' পেয়ে।

১৬) ম্যাঙ্গালোরে (শ্রীরঙ্গপত্তমে) প্রায় ৫,৬০০ খ্রীষ্টানদের হত্যা করা হয়েছিল টিপু সুলতান নামক নরপশু নায়কের নেতৃত্বে। এই নরপশুরাই কিন্তু ভারতীয় মুসলিমদের চোখে হিরো বা নায়ক। তাহলে এই হিরোর ফ্যানদের উদ্দেশ্য কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ভারতীয়দের হিন্দু?

১৭) ১৯২২-এ মোপলা বিদ্রোহের সময় ১০,০০০ হিন্দুর হত্যা হয় কেরালার মালাবারে। প্রায় ১লাখ হিন্দুর বিতাড়নও হয় সেখান থেকে। এর কৃতিত্ব গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলিম নেতাদের। পরে এরাই দেশভাগ করেও এখানেই থেকে যায় অবশিষ্ট ভারতকেও পাকিস্তান বানাতে।

১৮) ১৯৪৬-এর ১৫ই আগষ্ট থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বরে হওয়া 'দ্য গ্রেট ক্যালাকাটা কিলিং'-এর শিকার হন ১০,০০০ হিন্দু। কোলকাতায় হিন্দু হত্যা হয় পাইকারী রেটে। মুসলিম লীগের নরপশুরা কোলকাতার পর নোয়াখালিতেও সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরে (১৯৪৬) ৫,০০০ হিন্দুর কোরবানী' করে। ১লাক হিন্দুর ঠাঁই হয় 'রিলিফ ক্যাম্পে'। পরে ভারত ভাগের সময় ১৪ই এপ্রিল ও ১৫ই এপ্রিল-এই দুই দিনে শুধু দিল্লিতে হত্যা হয় প্রায় ২৫,০০০ হিন্দুর। সারা ভারতে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ১লাখ ৪০ হাজার।

কংগ্রেসী সেক্যুলার নেতারা তখন অহিংসার বুলি আউড়ে বেড়াচ্ছিল। অবশ্যই শুধু হিন্দুপ্রধান এলাকা গুলিতে!

১৯) ১৯৬৯-এ গুজরাতে বর্বর জেহাদীরা প্রায় ২০০ হিন্দুদের হত্যা করে। প্রত্যক্ষ মদতদাতা ছিল তৎকালীন কংগ্রেসের গুজরাত রাজ্য সরকার।

২০) একইভাবে হত্যা হয় ৫০০ বাঙালী হিন্দু শরণার্থীদের। স্থান ছিল ত্রিপুরার মান্তাই। সাল ১৯৮০।

২১) হাজারিবাগে ১৯৮৯-এর সেপ্টেম্বরে ৫৩ জন হিন্দুকে ও অক্টোবরে (১৯৮৯) প্রায় ৩৩১ জন হিন্দুকে জেহাদীরা হত্যা করে।

২২) 'স্বাধীন' ভারতে ১৯৯০ থেকে কাশ্মীরে শুরু করা হয় 'হিন্দুমেধ যজ্ঞ'। প্রায় ৫০০ হিন্দুকে মারা হয় ও প্রায় ২লাখ কাশ্মীরী হিন্দু পন্ডিতদের বাধ্য করা হয় তাঁদের নিজের সম্পত্তি ত্যাগ করে কাশ্মীর ছাড়তে।

এরপর ১৯৯৮-এ ওয়ানাধামায় ২৩ জন হিন্দুকে গুলি করে মারা হয়। তারিখটা ছিল ২৫শে জানুয়ারী। ওই বছরেরই ১৭ ই এপ্রিল মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরে (প্রাণকোটে) ২৬ জন হিন্দুকে আবারও হত্যা করে। না, এখানেই শেষ নয়। ১৯শে জুন (১৯৯৮) কাশ্মীরের চাপনারিতে আরও ২৫ জন হিন্দুর গণহত্যা হয় মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা।

১৯৯৮-তেই ৩৫ জন হিন্দুর (৩ রা আগষ্ট) হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলাতেও হত্যা হয়।

১৯৯২-এর ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বই প্রত্যক্ষ করে ২৭৫ জন হিন্দুর গণহত্যা। হত্যাকারীরা সেই জেহাদী নরপশুরাই।

ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করা নেতারাও মুসলিম তোষণের জন্য হিন্দু হত্যায় মোটেই পিছুপা না। হিন্দু হত্যাই যে মুসলিম ভোট পাবার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য চাবিকাঠি! তাই তো ১৯৯০ সালের ৩০শে অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের রামজন্মভূমি অযোধ্যাতেও অসংখ্যা হিন্দুর মৃত্যু হয় 'মৌলানা' মুলায়ম সিং যাদবের নির্দেশে পুলিশের গুলি চালনায়। ১৯৯৪ সালের

(১ম-২য়) অক্টোবরেও মারা হয় একইভাবে গুলি করে আরো ৬ জন হিন্দুকে।

২৩) মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা ২০০০ সালের ১লা আগষ্ট ৩০ জন অমরনাথ যাত্রীদের নৃশংভাবে হত্যা করে। এই 'স্বাধীন' ভারতেরই অঙ্গরাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরে ২০০১ সালের ৩রা আগষ্ট কিশ্তোয়ার গণহত্যা কাণ্ডে শহীদ হতে হয় আরও ১৯ জন হিন্দুদের-সেই ইসলামী জেহাদীদেরই হাতে।

২৪) আরও এক বর্বর ঘটনা ঘটে ২০০২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। স্থান-গুজরাটের আহমেদাবাদ। গোধরায় ৫৯ জন হিন্দুদের কংগ্রেসের এক মুসলিম কাউন্সিলের নেতৃত্বে জেহাদী ও উন্মত্ত সন্ত্রাসীরা জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। এই কাজে ১০০০-২০০০ মুসলিমের মদত ছিল আর এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে করে ৩১ জন জেহাদী মুসলিম।

শুধু তাই না- এরপর (২৮ শে ফেব্রুয়ারী) দিন দাঙ্গায় মৃত্যু হয় আরও ৭৯০ জন হিন্দুর। স্থান-গুজরাটের আহমেদাবাদ।

২৫) ২০০২ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রঘুনাথ মন্দিরে জেহাদী হামলা হয় ২ বার। ২৮শে ফেব্রুয়ারী আর ২৪শে নভেম্বর। প্রথম হামলায় ১৪ জন হিন্দুর মৃত্যু হয়। মোট আহত হন ৬৫ জন হিন্দু। ২০০২ সালের ১৩ই জুলাই জম্মু ও কাশ্মীরের কাশিমনগরে ২৯ জন হিন্দুর গণহত্যা হয় মুসলিম জেহাদীদের দ্বারা। ওই সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর গুজরাটের অক্ষরধামে মন্দিরে হামলা করে জেহাদী নরপশুরা হত্যা করে ২৯ জন হিন্দুদের। আহত হন ৭৯ জন হিন্দু। ওই সালের ১৪ই মে-র হামলায় জম্মু ও কাশ্মীরের বালুচকে ভারতীয় সেনা ও হিন্দু জনতা মিলিয়ে হত্যা হয় ৩১ জনের।

২০০২ সালে এত জায়গায় এত হিন্দুর হত্যা হলেও মেকি সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিরা শুধু গোধরা পরবর্তী কান্ড নিয়েই ব্যস্ত। এমনকি গোধরাতেও যে প্রায় ৮০০ জন হিন্দুর মৃত্যু হল তা নিয়ে তারা নির্বিকারে। হিন্দু প্রাণের কোন দামই যে নেই এই পেট্রোডলারের দাসত্ববৃত্তিকারীদের কাছে।

২৬) ২০০৬ সালে মার্চে বারানসীতে বোমা বিস্ফোরণ প্রাণ নেয় ২৮ জন হিন্দুর। সঙ্কটমোচন হনুমান মন্দিরে পূজারত, প্রার্থনায় ব্যস্ত ২০১ জন হিন্দু আহত হন।

মিলিয়ে দেখুন আগের ঘটনাগুলির সাথে। এদের পূর্বপুরুষেরা একইভাবে, একই কায়দায় সোমনাথ মন্দিরে হিন্দু হত্যা করেছিল। করেছিল অন্যান্য মন্দিরগুলিতেও। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। আগে শুধু ব্যবহার হত তরবারী, আর এখন হচ্ছে বন্দুক আর বোমা।

২৭) ২০০৬ সালের এপ্রিলে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় হয় আরও এক গণহত্যা। ইসলামী জেহাদীরা হত্যা করে ৩৫ জন নিরীহ হিন্দুদের।

২৮) ২০০৮-এর ২৬শে নভেম্বর মুম্বইয়ে পাকিস্তানী নরপশুরা ১৬৪ জন অ-মুসলিমদের হত্যা করে। আহত হন ৬০০-রও বেশি। ১১ জন ইসরায়েলি ইহুদীদের হত্যা করার আগে তাঁদের ওপর হয় অমানবিক অত্যাচার। যৌনাঙ্গ (তাঁদের) চিঁড়ে দেওয়া হয় ব্লেড দিয়ে। নিজেদের লুটেরা ও খুনী পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য সুন্দরভাবে রাখা একেই তো বলে!

২৯) ২০১২-য় আসামে কংগ্রেস সরকারের প্রশ্রয় পেয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা জুলাই মাসে আসামের বোড়ো, খ্রীষ্টান ও হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে। নিহত হন ৭৭ জন। বহিরাগত মুসলিমদের (বাংলাদেশীদের) দিয়ে দেশের হিন্দু নাগরিকদের হত্যাও চলে এই ভোট ভিখারী নেতাদের দেশে।

৩০) ২০১৩-য় উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে মুসলিম দুষ্কৃতীরা হিন্দু মেয়েদের সম্মান নিয়ে খেলা করলে সেই মেয়ের ভাই প্রতিবাদ করায় তাকে খুন করে মুসলিমরা। ক্ষমা না চেয়ে (এই জঘন্য কাজের জন্য) বরং মুসলিমরাই দাঙ্গা বাধিয়ে ওই সালের ২৫শে আগষ্ট থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০ জন হিন্দুদের হত্যা করে। আহত ও গৃহহীন হন প্রায় ৯৩ জন। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টির সরকার নির্দেশ জারি করে যে, সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা হবে শুধু দাঙ্গাপীড়িত মুসলিমদেরই, দেশভক্ত ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক হিন্দু জাতিদের সেখানে NO ENTRY. এইতো আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা। ওই রাজ্যেই ২০১৪ সালের ২৫শে জুলাই সাহারাননুর দাঙ্গায় ৩জনের (শিখ) মৃত্যু হয়।

এই লিস্ট কিন্তু Never ending. এই তো, অমরনাথ যাত্রীরা আবার শহীদ হলেন এই সেদিনও। তাই, হিন্দুদের ভাবতে হবেই যে, ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর ধরে যারা শুধু হিন্দু নিধনযজ্ঞে মেতে আছে, তাদের সাথে একসাথে থাকার আবার বৃথা চেষ্টা করবে নাকি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং-এর মতো দেশ, জাতি, ধর্ম ও সর্বোপরি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ ও মরণপণ চেষ্টা করবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। সময় কিন্তু বয়ে চলেছে। ইতিহাস থেকে যারা শিক্ষা নেয়না ইতিহাস তাদের কখনো ক্ষমা করে না। কারণ, History repeats itself. হিন্দুরা কি চায়? সোমনাথ মন্দির বা হিন্দুকুশের গণহত্যায় লক্ষ লক্ষ হিন্দুর হত্যা আবার হোক্? নিশ্চয় না। তাহলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে থেকে এখন থেকেই হিন্দু রক্ষার দায়িত্ব হিন্দুদেরকেই নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। ভারত মাতার জয় হোক্। তবে শুধু স্লোগানে এই জয় কিন্তু হবে না, দরকার অ্যাক্শন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইসলামের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং হিন্দুদের উদ্দেশ্যে প্রদেয় সাবধানবাণী

অর্ণব সরকার

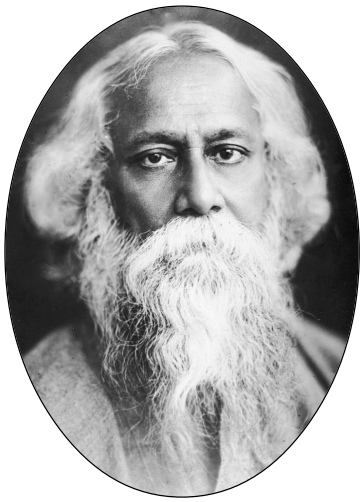

১) এই পৃথিবীতে দুটি ধর্ম আছে, যাদের সঙ্গে অন্য ধর্মের বৈরিতা বর্তমান। এই ধর্ম দুটি হল ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম। এরা শুধু নিজেদের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, পরন্তু অন্য সমস্ত ধর্মকে বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর। তাই এদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের একটাই রাস্তা আছে, আর তা হল তাদের ধর্ম গ্রহণ করা।

(১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী কালিদাস নাগ মহাশয়কে একটি পত্রে ইহা লিখিয়াছিলেন)।

২) ''হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ হয়ে থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সেই বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্তসহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায়, তাহা সত্য পরামর্শ নহে।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭, পরিচয়)

৩) ''হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটা সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২, পরিচয়)

৪) ১৯৩৯ সালের ৪ঠা জুন অমিতা (খুকু) সেনকে লেখা কবিগুরুর একটি চিঠিঃ

''হিন্দুর লেখা সাহিত্যে হিন্দুর মনোভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে বলে আজকাল মুসলমানেরা নালিশ করছে। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হিন্দু সাহিত্যিকদের ধরে ধরে মুসলমান করে দেওয়া। আমরা তো শেষ প্রহরে এসে পৌঁচেছি এখন সমস্যাটা তোদেরই স্কন্ধে এসে চাপবে। কোরানের তর্জ্জমা যদি হাতের কাছে থাকে তাহলে এখন থেকে পড়তে শুরু করে দে।" (রবীন্দ্র পত্রাভিধান, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্টা-১০৯)

৫) ''কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হই নি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এলো মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগলো, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনো একত্র হতে পারব না। খণ্ডিত ছিলেন বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬১)

৬)''ইতিহাসে দেখা যায়, নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৫, ইতিহাস")।

৭) ''কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোন বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩খণ্ড পৃষ্ঠা ৩১৭, কালান্তর)

৮) ''যে মুসলমানকে আজ ওরা সকল রকমে প্রশ্রয় দিচ্ছে সেই মুসলমানই একদিন মুষল ধারণ করবে"। (অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লেখা চিঠি, ১৫.১১.১৯৩৪, চিঠিপত্র-১১)

৯)''যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা"। (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৭, কালান্তর)

১০) হিন্দুর ওপর হয়ে আসা একতরফা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাধা প্রয়োগ এবং হিন্দুর অতিমাত্রিক সহিষ্ণুতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ ''যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তি প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দে শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবদ্ধহীন আইন ও বে-আইন-সহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া

দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫৫, রাজাপ্রজা)

১১) রাজনৈতিক নেতা, আঁতেলবুদ্ধিজীবী এবং মোল্লাদের চাটুকারদের উদ্দেশ্যে কবিগুরুর একটি কালবিজয়ী উক্তি, যা আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ঃ

''যদি এ কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমানদিগকে অসংগত প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি এইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে', কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির তো অন্ত নাই।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০৯, আত্মশক্তি ও সমূহ)

১২) ''আমি 'হিন্দু' নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই তাহা হইতে একলা পাশ কাটাইয়া আসি''। (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭, পরিচয়)

আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন ?

১) আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই কামপিপাসু আলাউদ্দিনকে, যার কামলোলুপতা থেকে সতীত্ব বাচাতে রানী পদ্মিনী সহ ১৪০০ নারী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিল ?

২) আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই নিষ্ঠুর ঔরঙ্গজেবকে যে, ছত্রপতি মহারাজ শিবাজির সুপুত্র শম্ভাজিকে ইসলাম গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় অবর্ণনীয় নির্যাতন করে হত্যা করেছিল ?

৩) আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই জেহাদী টিপু সুলতানকে, যে এক এক দিনে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের গণহত্যা করেছিল ?

৪) আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই নবী মুহাম্মদের মতো বিকৃত কর্মী শাজাহানকে যে, এক ১৪ বছরের ব্রাহ্মণ বালিকাকে ধর্ষণ করেছিল ?

৫) আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই অসভ্য বর্বর বাবরকে যে, আপনাদের প্রভু শ্রীরামের মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ বানিয়েছিল আর লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের গণহত্যা করেছিল ?

৬) আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই শয়তান সিকন্দর লোদীকে যে নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দিরের মা দুর্গার মূর্তি ভেঙে তার টুকরো টুকরো করে কসাইদের মধ্যে মাংস ওজন করার জন্য বিতরণ করেছিল ?

৭) হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন আল তাকিয়াবাজ সেই ধূর্ত খওয়াজা মোইনুদ্দিন চিস্তীকে, যে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করায় মহারাজ পৃথ্বীরাজ চৌহানের মহারানী সংযুক্তাকে উলঙ্গ করে তুর্কি সৈনিকদের সম্মুখে নিক্ষেপ করেছিল ?

৮) হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই নির্দয় ওয়াজিরখানকে, যে গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই নির্দোষ শিশুপুত্র ৭ বছরের ফতেহ সিংহ ও ৫ বছরের জোরাওর সিংহকে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করায় জ্যান্ত অবস্থায় দেওয়ালে গেঁথে দিয়েছিল ?

৯) হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই জেহাদী ওয়াজির খানকে যে বান্দা বৈরাগীর গাত্রচর্ম উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে পুড়িয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চর্ম পুড়ে অস্থি উন্মোচিত হয়েছিল ? কিন্তু এতদসত্ত্বেও বান্দা বৈরাগী ইসলাম গ্রহণ করেননি, প্রাণ দিয়েছিলেন। এই সব বীর হিন্দুদের অসম সাহসিকতার বলিদান সমন্ধে জানতে ভারতের ইসলামিক শাসনের ইতিহাস পড়ুন।

১০) আজ হিন্দুরা কি ভুলে গেছেন সেই কসাই ঔরঙ্গজেবকে, যে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করায় শিবাজী মহারাজের সুপুত্র শম্ভাজী মহারাজের চোখ উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে উপড়ে দিয়েছিল। আর পুড়িয়ে দিয়েছিল সারা শরীর ?

প্রত্যেকটা অত্যাচারের জবাব সুদে আসলে মিলিয়ে নিতে হবে, আসছে শুভ দিন.....এখন শুধু সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। সবাই ঐক্যবদ্ধ হন.....নিজ ধর্মকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সংঙ্ঘবদ্ধ হোন। তবেই বেরিয়ে আসবে সমাধান। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গঠনের সপক্ষে সকল হিন্দুরা পোষ্টটি শেয়ার করুন।

সংকলন ঃ রেজাউল মানিক

(তথ্য সৌজন্য ঃ শুভ বসু)

আমার কাশ্মীর

দেবশ্রী চক্রবর্তী

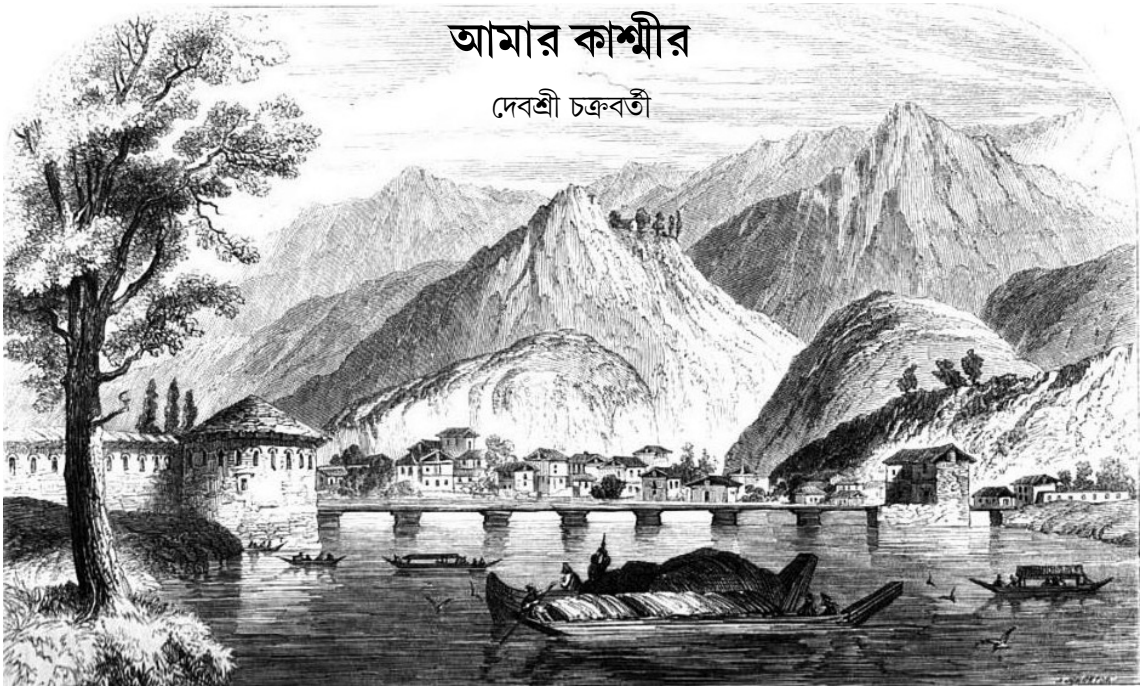

আমার দেশ ভারতবর্ষ, আমার প্রাণের জন্মভূমি। দেশের প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশের জায়গা সেই অর্থে আমার ল্যাপটপের নোট প্যাড। যেখানে নান সময় কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোট গল্পের মাধ্যমে আমি আমার দেশের মানুষ এবং তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমার লেখায় কাশ্মীর বারংবার উঠে আসে। ভয়ঙ্কর এক পাষাণ ভেদী আর্তনাদ প্রতিফলিত হয় শব্দের মূর্ছনায়। আজ আবার কাশ্মীর সম্পর্কে কলম ধরলাম। এখানে যে তথ্য তুলে ধরব কোন বাংলা উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধে তা খুঁজে পাবেন না। কাশ্মীর সম্পর্কে বেশ কিছু ইতিহাস বই, আর্টিকেল এবং ডকুমেন্ট্রির ওপর নির্ভর করে আমার ল্যাপটপের কি বোর্ডে হাত লাগালাম। শুরু করার আগে একটা কথা বলব, কাশ্মীর যতটা কাশ্মীরিদের ঠিক ততটাই আমার। কারণ আমার মায়ের শরীরের অবিচ্ছিন্ন অংশ কাশ্মীর।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন '' পৃথিবীতে স্বর্গ থেকে থাকলে তা এখানে, তা এখানে, তা এখানে'' সেই সৌন্দর্য হয়তো আজও আছে কিন্তু বোমা, বন্দুকের গুলিতে কাশ্মীর আজ অশান্ত।

পৌরাণিক কাহিনি এবং নামকরণ- কাশ্মীর শব্দের অর্থ হল শুকিয়ে যাওয়া ভূমি। অনেক অনেক দিনে আগে চারদিকে হিমালয় আর পীর পাঞ্জল পাহাড় ঘেরা এই এলাকায় ছিল বিশাল এক হ্রদ। রাজা দক্ষ তনয়া সতী'র হ্রদ নাম অনুসারে নাম ছিল সতীসর। সেই হ্রদে বাস করত এক দৈত্য। নাম তার ''জলোদ্ভব'' দৈত্যের অত্যাচারে লোকজন থাকত সন্ত্রস্ত। অবশেষে কাশ্যপ ঋষি এগিয়ে এলেন তাদের সাহায্য করতে। কাশ্যপ ছিলেন ব্রহ্মাপুত্র মারিচের ছেলে। যে সাতজন মুনি বা ঋষিকে সপ্তর্ষি বলা হয়ে থাকে তাদের একজন হলেন ব্রাহ্মণ ঋষি কাশ্যপ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ অনুসরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন কাশ্যপ। ঋষি কাশ্যপের আবেদনে তুষ্ট হয়ে ভগবান এগিয়ে এলেন। বিশাল এক শূকর বা বরাহের রুপ নিয়ে গুতো দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন এক দিকের পাহাড়। ফলে হ্রদ গেল শুকিয়ে আর মারা গেল সেই দৈত্য। যেখানে শুকর বা বরাহরূপী বিষনু পাহাড় ভেঙ্গেছিলেন তার নাম হল বরাহমুল, যা এখন বারমূল্লা নামে পরিচিত। হ্রদ শুকিয়ে জেগে ওঠা পাহাড় ঘেরা এই উপত্যকাই হল কাশ্মীর উপত্যকা। লোকজনের বসতি গড়ে উঠল নতুন জেগে ওঠা এই উপত্যকায়। কাশ্যপ ঋষির দেশ বা ''কাশ্যপ-মার'' থেকে ক্ষশ নাম হল কাশ্মীর। ঋষি কাশ্যপের আমন্ত্রণে সারা ভারত থেকে লোকজন এসে বসতি গড়ে তুলল এই উপত্যকায় যারা কালক্রমে হলেন কাশ্মীরি পন্ডিত। নিলমত পূরান এবং ১২শ শতাব্দীতে কল্হন রচিত গ্রন্থ ''রাজতরঙ্গিনী'' কাশ্মীর উপত্যকা নিয়ে রচিত আদি গ্রন্থ। চীনা পর্যটক ''হিউ-এন-সাং'' এর বইয়ে এই এলাকার পরিচয় মেলে

''কা-শি-মি লো'' রুপে আর প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে বলা হত ''কাস্পেরিয়া'' মহাভারতে উল্লেখ আছে কাম্বোজ রাজাদের অধীন ছিল এই এলাকা। কাম্বোজরা ছিলেন ভারত এবং পারস্য হতে উদ্ভূত জাতি গোষ্ঠী। পাঞ্চাল রাজবংশ রাজত্ব করতেন এই এলাকায় যেখান থেকে পাহাড় শ্রেণীর নাম হয় ''পাঞ্জাল'' পরে মুসলীম শাসনাকালে ''পীর'' শব্দ যুক্ত হয় যা থেকে নাম হল ''পীর পাঞ্জাল''। ১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীনতা অর্জন করল, কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিং তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তিনি ভারত না পাকিস্তান কার সাথে যোগ দেবেন। মাউন্টব্যাটেন যখন তাঁর কাছে জানতে চান যে তিনি কার সাথে থাকতে চান, হরি সিং জানান কাশ্মীর কারুর সাথে যোগ দেবে না, সে স্বতন্ত্র থাকবে। হরি সিং এর মতন একজন দুর্বল শাসকের পক্ষে কাশ্মীরকে শাসন করা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে শুরু হয় অশান্তি। সেইসময় কাশ্মীরি মুসলিমদের এক নেতা জিন্নার কাছে যান কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কি হবে জানতে। জিন্না বলেন, ''কাশ্মীর আমার পকেটে''। ১৯৪৭ এর ২২এ অক্টোবর পাকিস্তানের আটকোবাদ আর কাশ্মীরের মুজফফরাবাদের মাঝে বয়ে চলা ভয়ঙ্কর ঝিলম নদী পার করে হাজার হাজার পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলের ট্রাইবাল দস্যুরা ঢুকে পড়ে কাশ্মীরে। তাঁরা যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে যায় খুন, ধর্ষণ, লুঠতরাজ চালাতে থাকেন। পরিস্থিতি যখন হাতের বাইরে চলে যায় হরি সিং কাশ্মীর থেকে পালিয়ে যান। সংবাদপত্র, রেডিও, সারা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে যায় কাশ্মীর, কি হচ্ছে কাশ্মীরে বাইরের পৃথিবীর কাছে অজানা থেকে যায়। এমনকি কাশ্মীরের মানুষ প্রথম দিকে বুঝতে পারছিলেন না যে কাশ্মীর আক্রান্ত হয়েছে। বারামুল্লার একটি সিনেমা হলকে রেপ সেন্টার বানান হয়। সেখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, সাই, নির্বিশেষে চলতে থাকে কাশ্মীরি মেয়েদের ধর্ষণ।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৭-জিন্নার অঙ্গুলিহেলনে কাশ্মীরের পশ্চিম অংশের উপজাতীয় বিদ্রোহীরা আর পাকিস্তানি সেনারা কাশ্মীর আক্রমণ করলো, মহারাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাদের লক্ষ্য মহারাজকে জোর করে অপসারিত করে কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা। ওইসময় যে স্লোগানটি পাকিস্তানীদের মুখে মুখে ফিরত তা হল '' হসকে লিয়া পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান'' অর্থাৎ হেসে হেসে পাকিস্তান পেয়েছি এবার লড়াই করে হিন্দুস্থান নেবো। এছাড়া জিন্নার শ্লোগান-'কাশ্মীর বনেগা পাকিস্তান' তো ছিলই। বিদ্রোহীদের অভিযোগ ছিল এই যে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদানের মতলব আঁটছিলেন। বিদ্রোহীরা মোজাফফরপুর, ডোমেল দখল করে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছে গেল রাজধানী শ্রীনগরের উপকণ্ঠে। পুঞ্চ এ মহারাজা হরি সিং এর বাহিনী হল বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ, জয়ের সাথে সাথে সমানে চলল লুটপাট ও নৃশংস হত্যালীলা। মহারাজা হরি সিং প্রমাদ গুনলেন, বিপদ বুঝে তিনি সাহায্য চাইলেন নেহেরুজীর কাছে এবং জানালেন তিনি ভারতের সাথে যুক্ত হতে চান। ২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৭, লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর উপস্থিতিতে সাক্ষরিত হল ''Instrument of Accession'', জম্মু-কাশ্মীর হল এক ভারতীয় রাজ্য। আর ভারতভুক্তির শর্ত হিসাবে জম্মু-কাশ্মীর কে সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ মর্যাদা দেবার সংস্থান রাখা হয়। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। আগে দেখে নিই সেইসময়ে কি হয়েছিলো? নেহেরুজীর আদেশ অনুসারে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতি আক্রমণ শুরু করল হানাদার পাক বাহিনীকে হটানোর জন্যে, শুরু হল স্বাধীনতার পর ভারত এবং পাকিস্তানের প্রথম যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে যখন ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর ভ্যালি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পুনুরুদ্ধার করে ফেলে বাকী এক-তৃতীয়াংশ এবং গিলগিট, বালতিস্থান উদ্ধারের জন্যে আগুয়ান, জয় যখন প্রায় করায়ত্ত, তখন কোন এক রহস্যময় কারণে নেহেরুজীর আদেশে ভারতীয় বাহিনী মাঝপথে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। নেহেরুজীর এই অমার্জনীয় ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ভারত আজও করে চলেছে। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সময়ে পাকিস্তান যে জায়গা দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছিলো সেটাই আজকের Pakisthan Occupied Kashmir বা POK, পাকিস্তান অবশ্য বিশ্বের চোখে ধুলো দিতে এর গালভরা নাম দিয়েছে-''আজাদ কাশ্মীর'', যেখানে আজাদির ছিটেফোঁটা নেই, আছে শুধু না পাওয়ার জ্বালা আর তীব্র শোষণ। এরপর সিন্ধু নদ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, পাকিস্তান তাঁদের দখলীকৃত কাশ্মীরের একটা অংশ চীনকে উপহার স্বরূপ দিয়েছে, যা আজ Chaina Occupied Kashmir বা COK নামে পরিচিত।

পাকিস্তান এর পরেও ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯৯ সালে কাশ্মীর ফিরে পাওয়ার আশায় যুদ্ধ করেছে, আর প্রতিবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে শোচনীয় হারের পর পাকিস্তান ভারতের সাথে ''সিমলা চুক্তি'' করে যেখানে সিদ্ধান্ত হয কাশ্মীর নিয়ে যাবতীয় শত্রুতা দুই দেশই আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেবে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখা গেলো? মোটামুটিভাবে ১৯৯০ সাল অবধি কাশ্মীর বেশ

শান্তই ছিল, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ কমই ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ন্যাশানাল কনফারেন্স পার্টির শেখ আবদুল্লা, তাঁর পুত্র ফারুক আবদুল্লা, পৌত্র উমর আবদুল্লা, কংগ্রেস পার্টির গুলাম নবী আজাদ এবং পিপলস ডেমোক্রাতেক পার্টির মুফতি মোহাম্মদ সইদ প্রমুখ। তাহলে ১৯৯০ সালে কি এমন হল? কেনই বা নতুন করে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল কাশ্মীর উপত্যকায়? এই বিষয়ে সঠিক অনুধাবন করতে গেলে আমাদের কয়েক দশক পিছিয়ে যেতে হবে এবং দেখতে হবে ১৯৭৫-১৯৯০ এই সময়ে পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে কি হয়েছিলো?

সত্তরের দশকের শেষ দিকে আফগানিস্তানে হানা দেয় তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া, সেই সময়ে আমেরিকার সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার ঠান্ডা যুদ্ধ তুঙ্গে। অতএব আফগানিস্তানে রাশিয়াকে আটকাতে আমেরিকার বোড়ের চাল হয়ে উঠল পাকিস্তান। সবে সামরিক অভ্যুত্থান করে ক্ষমতায় এসেছেন জেনারেল জিয়া উল হক, আমেরিকার হাত তখন তাঁর মাথায়। ডলার আর উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের লোভে পাকিস্তান বিদ্রোহী আফগানদের সাহায্যের জন্যে শুরু করলো জিহাদি ট্রেনিং ক্যাম্প, বেশকিছু আবার দখলীকৃত ''আজাদ কাশ্মীর'' অংশে। সেইসব ক্যাম্পে তৈরি হতে লাগলো হাজার হাজার ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ তালিবান জিহাদি। এই জিহাদি যুবকদের হাতে অস্ত্র জোগানোর ভার নিয়েছিল আমেরিকা, পরবর্তীকালে এই সর্বনাশা জোটে এলো সৌদি আরব। আরব ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে তখন বিশ্ব বাজারে হু হু করে বাড়ছে পেট্রো-তেলের দাম, সৌদি রাজবংশের তখন রমরমা অবস্থা, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ আর কি। এই সুযোগে তাঁরা বিশ্ব জুড়ে রপ্তানী করা শুরু করলো ওয়াহাবি ইসলামের বিষ, বিভিন্ন দেশে তখন সৌদি অর্থে তৈরি হচ্ছে একের পর এক মসজিদ। এগুলির মাধ্যমেই সৌদি রাজবংশ ছড়িয়ে দিতে লাগলো তাঁদের ওয়াহবি প্রপাগান্ডা। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ধর্মের ভাইরাস আর অর্থের সংমিশ্রণে তৈরি এক ভয়ঙ্কর টাইমবম্ব। পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত জিহাদি/মুজাহিদ আফগান, পাঠান ভাইরা তখন আফগানিস্তানে হাজারে হাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এই যুদ্ধ তাঁদের কাছে তখন ধর্মযুদ্ধের সমান। চিন্তায়, মননে কি ভয়ানক ওয়াহাবি টক্সিক, আর শহিদ হওয়ার পর তাঁদের জন্যে তো আছেই জান্নাত, হুরী ইত্যাদি।

পাকিস্তান তো আনন্দে আটখানা, একদিকে আফগান যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্যে আমেরিকা দিচ্ছে কোটি কোটি ডলার, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র (পরবর্তীকালে যা ব্যবহৃত হবে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে), অন্যদিকে দেশের বেকার সমস্যার কি চটজলদি সমাধান? দেশের হাজার হাজার যুবক ওয়াহবি মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে জিহাদি হয়ে উঠছে, সুতরাং তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের কোন দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হচ্ছে না। পাকিস্তানি আর্মি, আইএসআই এবং ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদদের বিদেশী ব্যাঙ্ক ভরে উঠছে ডলারে। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট, সময়ের চাকা যে এক জায়গায় থেকে থাকে না এই সত্যটা অনুধাবন করতে পাকিস্তানের নেতৃবর্গের বোধহয় কষ্ট হয়েছিল। কারণ ৮০ দশকের শেষদিকে আফগানিস্তান থেমে পিছু হটতে থাকে রাশিয়া, পরবর্তীকালে আমেরিকাও হাত ধুয়ে ফেলে আফগানিস্তান থেকে। পাকিস্তান সমস্যায় পড়ে তাঁদের নিজেদের সৃষ্ট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন মানে এই জিহাদিদের নিয়ে-যারা ধর্মের নামে মারা আর মরা ছাড়া কিছুই শেখেনি। আসলে বাঘের পিঠে চাপলে অত সহজে তো নামা যাবে না, তাই পাকিস্তান এই জিহাদিদের কিছু অংশকে ভিড়িয়ে দিলো ভারতের কাশ্মীর অংশে, সেইসাথে স্থানীয় কাশ্মীরি যুবকদের মগজধোলাই করে তাঁদের হাতে তুলে দিলো অস্ত্র আর মগজে ওয়াহাবি টক্সিকের বিষ। কাশ্মীরি যুবকেরা জিহাদি হয়ে উঠল, শান্ত কাশ্মীরে প্রবেশ করলো টক্সিক ওয়াহাবি মতবাদ। যেখানে কাশ্মীরি পন্ডিতদের সাথে, যা মিলেমিশে সৃষ্টি করেছে এক অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, যাকে বলা হতো-''কাশ্মীরিয়াত''। হিন্দু কাশ্মীরি পন্ডিতের বাড়ীর অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খেত কাশ্মীরি মুসলমান, আবার ঈদের দিনে কাশ্মীরি মুসলমান ভাইয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ থাকত ওই কাশ্মীরি পন্ডিত পরিবারটির। কিন্তু পরবর্তীকালের বিষ মেরে ফেলল এই অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভালোবাসাকে। ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হল কাশ্মীরি পন্ডিত খেদাও অভিযান, মিছিল জমায়েত থেকে আওয়াজ উঠতে লাগলো-''নারায়ে তাকদির, আল্লা হো আকবর। পন্ডিত মহল্লায় হামলার সময় মসজিদের মাইকে আজানের আওয়াজ বহু গুন বাড়িয়ে দেওয়া হল যাতে আর্তনাদ, চিৎকার বাইরে শোনা না যায়। স্লোগান দেওয়া হতে লাগলো-''হাম ক্যা চাহতে আজাদি কিংবা অ্যায় জালিমো, অ্যায় কাফিরোঁ, কাশ্মীর হমারা ছোড় দো''। হত্যা, অপহরণ, লুটপাট, মহিলাদের রেপ কোন কিছুই বাদ গেল না, ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পন্ডিত পরিবার হল কাশ্মীর ছাড়া। বেশিরভাগ আশ্রয় পেল জম্মুতে তৈরি হওয়া আশ্রয় শিবিরে আর বাকিরা ছড়িয়ে পড়ল ভারতের অন্যান্য শহরে। জম্মুর হাঁসফাঁস করা গরমে নোংরা বস্তির এক চিলতে তাঁবুতে কোনমতে সংসার, সরকারের দেওয়া রেশনের চাল-ডালের ডোল নিয়ে কোনরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি। এক সময়ে

যাঁদের আপেলের বাগান ছিল, দেওদার কাঠের বহুমুল্য আসবাব ছিল তারাই জম্মুতে চরম অসম্মানের জীবন যাপন করে চলেছেন। কই তাঁদের জন্যে তো তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলের কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে দেখি না?

কাশ্মীর, আমার ভালবাসার ভূস্বর্গ, তোমাকে নিয়ে যত লিখি লেখার আকর্ষণ ততই বাড়তে থাকে। আজ সাম্প্রদায়িকতার বীজ ও কাশ্মীর নিয়ে লেখার জন্য কলম ধরেছি। কাশ্মীরের ওপর হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম সব শাসকরা রাজত্ব করেছেন, কিন্তু হিন্দু মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় ছিল, তবে এমন কি ঘটল সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠল এই ভূখন্ডে? এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়েছিলেন ইংরেজরা, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।

আজ কাশ্মীরের যে ইতিহাস বলতে যাচ্ছি, সে ইতিহাস জানার জন্য আমাদের পৌঁছে যেতে হবে দেড়শত বছর আগে। কাশ্মীরের ডোগরা রাজারা ছিলেন ইংরেজদের বন্ধু, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও তাঁরা ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজরা এমন এক জাত যারা সু-দিনে দুর্দিনের বন্ধুকে মনে রাখে না। বিপদ কেটে যেতেই ইংরেজরা ভুলে গেলেন ডোগরা রাজবংশের উপকার। ততদিনে ইংরেজরা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব। রাশিয়ার জারকে রুখতে গিলগিটে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, শুরু হযে গেল কূট কৌশল, রনবীর সিং-এর বড় ছেলে প্রতাপ সিংহ ছিলেন নেহাত ভালো মানুষ, তিনি ধর্ম কর্মে বেশি মনোনিবেশ করলেন, এই সুযোগে ইংরেজরা কাশ্মীরে বসালেন নতুন রেসিডেন্সি। তাঁর কর্তা হয়ে এলেন স্যার অলিভার সেন্ট জন, কাশ্মীরের প্রথম রেসিডেন্ট।

রাজা প্রতাপ সিং-এর ভাই ছিলেন অমর সিং, তাকে ইংরেজরা কাশ্মীরের সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে হাত করে নিলেন, ভাই অমর সিং দাদার সরলতার সুযোগ নিয়ে সাদা কাগজে দাদার সই নিয়ে কাশ্মীরের সিংহাসন নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন, সারা পৃথিবীর মানুষ জানলেন প্রতাপ সিং ধর্ম কর্মে মন নিবেশ করতে চান, তাই ভাইকে সব সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিলেন। দীর্ঘ ১৫বছর গৃহ বন্দী থাকার পর প্রতাপ সিংহ একটি চিঠি লিখলেন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের কাছে। মহারাজ লিখলেন তাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হোক, কিংবা বুকের মাঝে গুলি করে হত্যা করা হোক। এ অপমান এবং যন্ত্রণার জীবন যে আর তাঁর ভালো লাগে না। কলকাতার খবরের কাগজে কাশ্মীরে ইংরেজদের জালিয়াতির খবর প্রকাশিত হল, পার্লামেন্টে ঝড় উঠল। উদারনৈতিক সদস্য চার্লস ব্র্যাডলে মহারাজের পক্ষ নিলেন, উইলিয়াম ডিগবি ছিলেন সেকালের একজন ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজ। তিনি মহারাজের প্রতি অবিচারের জোরাল প্রতিবাদ করলেন। অগত্যা ইংরেজ সরকারকে প্রতাপ সিং-কে কাশ্মীরের সিংহাসন ফেরত দিতে হয়। ক্রমে মহারাজের চুলে পাক ধরল, চোখে পড়ল ছানি, মহারাজের কোন পুত্র না থাকায় মৃত্যু শয্যায় তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন তাঁর ভাই অমর সিংহের পুত্র হরি সিং-কে।

হরি সিং সিংহাসনে বসে প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবে কাজ করতে থাকেন, তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজা যিনি লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে বলেছিলেন যে ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতেই দেওয়া উচিৎ। ভারতীয় রাজার মুখে এমন কথা? ইংরেজ সরকার খুশি হলেন না, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যুগিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা শুরু হল।

ওদের হাতিয়ার ছিল কাশ্মীরের সরল অজ্ঞ মুসলিম প্রজাদের উস্কে দেওয়া। অয়েকফিল্ড নামে একজন ইংরেজ ছিল মহারাজের মন্ত্রী, তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল কাশ্মীরের মুসলিম প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে হিন্দু রাজা এই বলে প্রচার চালাতে থাকেন। পাঞ্জাবের অড়হর আর মহম্মদীয়া দোলের নামজাদা সাম্প্রদায়িক নেতারা এবং কয়েকটি উদু কাগজে তাঁর প্রচার চলতে থাকে। পত্রিকাগুলি বিনা মূল্যে দেওয়া হতে থাকে কাশ্মীরের মুসলমানদের। কাশ্মীরের বুক থেকে উঠে এলো তরুণ শিক্ষিত নেতা শেখ আবদুল্লা।

ভারতবর্ষের বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানো হতে থাকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং আলিগড়ের কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার বেক আর থিওড্র মরিসন সে মাটিতে যুগিয়েছিলেন সার ও জল। কাশ্মীরে যখন সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের চারা বোনার কাজ শুরু হয় তখন মহারাজ বিদেশে ছিলেন, এইসময় কাশ্মীরের বুকে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়।

এই ঘটনার কয়েক বছর পর আবদুল্লা গিয়েছিলেন পেশোয়ারের একটি সভায়, সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি দেখলেন একজন মুসলিম জমিদার তাঁর হিন্দু প্রজাদের দিয়ে আমবাগানে কি অমানবিক পরিশ্রম করাচ্ছেন, কেউ যদি ঠিক করে কাজ না করতে পারেন তাঁর পিঠে জুটছে চাবুকের বাড়ি এবং পারিশ্রমিকও কেটে নেওয়া হচ্ছে। এই সময় আবদুল্লা প্রথম অনুভব করলেন গরিব মানুষের কোন ধর্ম হয় না। পরে তিনি বহু হিন্দু মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন এবং দরিদ্র হিন্দুর মৃত্যু হলে তাঁর শেষকৃত্যের দায়িত্বও নিয়েছিলেন।

এবার বলব ব্রিগেডিয়ার ওসমানের কথা। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমী, একবার এক সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতা

বিলেতে তাঁকে বলেছিলেন ও আপনি জাতিতে মুসলমান, আমিও তাই, জেনে খুব খুশি হলাম।

ওসমান বলেছিলেন আমি জাতিতে ভারতীয়, তবে ধর্মের দিকে আমি মুসলিম। দেশভাগের সময় তিনি ছিলেন মুলতানে, দেশভাগের বহু বিভীষিকা লক্ষ্য করেছেন নিজের চোখে। বহু হিন্দু ও শিখ পরিবারকে সাহায্যও করেছেন। গান্ধীজীর হত্যার পর মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার ওসমাইন পাকিস্তানি দখলদারদের কাছ থেকে কাশ্মীরের নউশেরা, ঝাংগড়, রাজউরী, পুঞ্চ রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি, পুষ্পস্তবক সাজিয়ে বীরের মৃতদেহ বিমানযোগে নিয়ে আসা হয় দিল্লি। সেখানে হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, পারসিক, মুসলমানেরা শ্রদ্ধা ভরে ফুল দিয়েছিলেন শবাধারে। জাতীয় পতাকায় ঢেকে কামানের গাড়িতে হল পূর্ণ সামরিক সম্মানে যাত্রা। শবানুগমন করলেন স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর তিন প্রধান ।

আমার লেখা শেষ করব ব্রিগেডিয়ার প্রতীপ সেনের কথা দিয়ে। ব্রিগেডিয়ার সেনের জন্যই পুঞ্চে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল।

মৌর্য সম্রাট অশোক কাশ্মীর-এর রাজধানী শ্রীনগরের গোড়া পত্তন করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে। তখন বৌদ্ধ ধর্ম ছিল এলাকার প্রধান ধর্ম। ৮ম শতাব্দীর শেষে বা নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত হিন্দু পন্ডিত শঙ্করাচার্য কাশ্মীর-এ আসেন। কথিত আছে সারদাপীঠ মন্দিরের চারটি দরজা ছিল, দক্ষিণ এর দরজা সবসময় বন্ধ থাকত, যাতে দক্ষিণ দিক থেকে কোন পন্ডিত আসতে না পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য তর্ক যুদ্ধে মন্দিরের পুরোহিতদের পরাজিত করে দক্ষিণ দিক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। অভিনব গুপ্ত ছিলেন দশম শতাব্দীতে কাশ্মীর এ জন্ম নেওয়া পন্ডিত। কাশ্মীরে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। মধ্য এশিয়ার তুর্কোমেনিস্তান থেকে দুলুচা ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে জজিলা গিরিপথ দিয়ে কাশ্মীর দখল করে নেন। দুলুচা তার চলার পথে সব নগর গ্রাম ধ্বংস করে দেয়। বস্তুত এই সময় থেকেই কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্বের সমাপ্তি হয়।

হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাজা রিনিন প্রথম মুসলিম শাসক হন। এইসব শাসকদের মধ্যে কেউ ছিলেন সহনশীল, কেউ ছিলেন অন্যরকম। সিকন্দর বুশতি খান ছিলেন ভয়ানক অত্যাচারী। তিনি সমস্ত মন্দিরের মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং হিন্দু ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অনেক কাশ্মীরি পন্ডিত এইসময় কাশ্মীর ছেড়ে পালান, কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন। ১৫৮৫ তে কাশ্মীর মুঘল শাসনের অধীনে আসে। মোঘলদের থেকে পরে কাশ্মীর চলে যায় আফগান দুরবানী সম্রাটদের হাতে।

১৮১৯-এ শিখ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসময়ে গো হত্যা নিষিদ্ধ, আজান, মাদ্রাসা সব নিষিদ্ধ করে মুসলিম বিরোধী কাজ শুরু হয়। কাশ্মীর -এর সাথে তিব্বতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। মহান পদ্মসম্ভবা বহু বছর কাশ্মীর-এর থেকে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এগারো শতকে লক্ষী নামে একজন মহিলা কাশ্মীরি পন্ডিত তিব্বতে গিয়েছিলেন আনুত্তরাযোগা তন্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করতে। তাকে দেখে পরবর্তীসময় বহু কাশ্মীরি পন্ডিত তিব্বতে জ্ঞানের পিপাসায় ছুটে যান। এদের তিব্বত থেকে উপাধি দেওয়া হয় ভট্ট। এর অর্থ একজন শিক্ষিত মানুষ।

কাশ্মীর-এ বুদ্ধের লেখা প্রথম সংস্কৃতে লেখা হয়, কুমার জিবা নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যার বাবা ছিলেন একজন কাশ্মীরি পন্ডিত, তিনি বুদ্ধের লোটাস সূত্র প্রথম চীনা ভাষায় সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা ঘটনা বলি। আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে মিহিরকুল পীরপাঞ্জাল পার করে যখন কাশ্মীরে আসছিলেন, তখন তিনি দেখেন একটা হাতি পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে। হাতির কান্না শুনে রাজার মন খুশিয়াল হয়ে যায়। পরে তার আদেশে ১০০ হাতিকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

কাশ্মীরি পন্ডিতদের ওপর অত্যাচার সব যুগেই হয়েছে। সুলতান সিকন্দর কাশ্মীরের শাসক হলে, তিনি হিন্দুদের জন্য ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যত হিন্দু লেখা পেয়েছিলেন সব ধ্বংস করেন, একের পর এক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু মারতানের সূর্য মন্দির ধ্বংস করতে পারেন নি। তার সময় বহু পন্ডিত কাশ্মীর ত্যাগ করেন। বহু পন্ডিত ধর্মান্তরিত হন। সিকন্দর শাহ কাশ্মীরে বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সিকন্দরের পর তার পুত্র আলি শা এই ধারা বজায় রাখেন। ১৪২০ তে জাইনুল আবেদিন সিংহাসনে বসে নৃশংসভাবে কাশ্মীরি পন্ডিতদের সংহার শুরু করেন। সেই সময় তিনি কোন এক অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হলে এক কাশ্মীরি পন্ডিত তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুললে তিনি ভট্টকে বলেন তোমার কি উপহার চাই বলো? ভট্ট বলে আমার একটাই অনুরোধ, আপনি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করুন। পরবর্তী সময় আবেদিন একজন সু-শাসকে পরিণত হন এবং তার সময় বহু হিন্দু উচ্চপদে নিযুক্ত হন।

আকবর আর জাহাঙ্গীর-এর সময় কাশ্মীরে কোন সমস্যা

ছিল না। জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে বহু বাগান তৈরি করেছিলেন। ১৬২৭-এ তার মৃত্যুর সময় তাকে প্রশ্ন করা হয় আপনার শেষ ইচ্ছা কি? উনি বলেছিলেন শুধু কাশ্মীর আর কিছু না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময় কাশ্মীরি পন্ডিত নিধন আরম্ভ হলে পন্ডিতরা নবম শিখ গুরু তেগবাহাদুরের কাছে আশ্রয় চান। তেগ বাহাদুর বলেন, তোমরা ঔরঙ্গজেবকে বলো উনি যদি আমাকে ধর্মান্তরিত করতে পারেন, তাহলে সব কাশ্মীরি পন্ডিতরা একসাথে ধর্মান্তরিত হবে। কিন্তু তেগবাহাদুরকে ধর্মান্তরিত করা যায়নি, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

১৭৫২ সাল থেকে কাশ্মীর এ আফগান শাসন আরম্ভ হয়। সে এক ভয়ঙ্কর সময়। THE VALLEY OF KASHMIR, WALTER R A WRENCE লিখেছেন, আফগান শাসক আসয়াদ খান এবং তার পরবর্তী শাসকরা কাশ্মীরি পন্ডিতদের দুজন করে বেধে ডাল লেকে ফেলে দিতেন এবং কাশ্মীরি পন্ডিত দেখলে তাদের পিছনে লাথি মারা এবং তাদের রাস্তাঘাটে বেধে দাড় করিয়ে মাথায় হাড়ি রেখে পাথর ছুড়ে সেই হাড়ি ভাঙ্গা হত, এতে বহু পন্ডিতের মৃত্যু হত।

পরবর্তীকালে ডোগরা রাজারা কাশ্মীরে শাসনে আসেন। এরা মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। বহু মুসলিমকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেওয়া, আজান নিষিদ্ধ করা, গো হত্যা নিষিদ্ধ করেন। ১৯৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর কাশ্মীর-এর শের এ কাশ্মীর স্টেডিয়ামে শেষবারের মতন ক্রিকেট খেলা চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত। সুনিল গাভাস্কর কৃষ্ণা মাচারি শ্রীকান্ত ব্যাটিং করছে। এইসময় গ্যালারিতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি ওঠে। কিছু মানুষ পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের ছবি নিয়ে আসে। জামাত এ ইসলামের ব্যানার নিয়ে তারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে থাকে। দিলীপ ভেঙ্গসরকার ব্যাটিং করতে নামলে তাকে আধ খাওয়া আপেল ছুড়ে মারা হয়। সেই ম্যাচ ইন্ডিয়া হেরে যায়। এরপর আর কোন খেলা কাশ্মীরে হয়নি। পরে কীর্তি আজাদকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সেদিন মনে হচ্ছিল যেন পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলছি।

১৯৮৬ সাল থেকে ১৫ই আগষ্ট ইচ্ছা করে ব্ল্যাক আউট করে রাখা, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের খেলা হলে হিন্দুদের জানালায় পাথর ছোঁড়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

১৯৮৬ সালের ১৮ই এপ্রিল-এর একটি ঘটনা তুলে ধরছি। সারজাতে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের খেলা হচ্ছে। জাভেদ মিয়াঁদাদ শেষ বলে ছয় মেরে পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হলো শ্রীনগরে দিওয়ালী শুরু হলো। এত বাজি সেদিন পোড়ান হয়েছিল যা পন্ডিতদের বিস্মিত করেছিল।

কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় থাকতেন কাশ্মীরি বিখ্যাত কবি সর্বানন্দ কল ''প্রেমী''.....তিনি রবীন্দ্রনাথ-এর গীতাঞ্জলি এবং গীতার কাশ্মীরি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। একজন স্বনামধন্য মানুষ, যিনি সব সময় ভাবতেন তাকে ছোঁয়ার সাহস এই উপত্যকায় কারুর নেই। কবি একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ছিলেন। নিয়মিত কোরান এবং গীতা পাঠ করতেন। তিনি ১৯৪৬-৪৭ এ কাশ্মীরি ডোগরা রাজাদের বিরুদ্ধে কাশ্মীর ছাড় আন্দোলন এবং তার আগে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় আন্দোলন করেছিলেন।

দিনটা ছিলো ২৯শে এপ্রিল ১৯৯০। কিছু অস্ত্রধারী মানুষ তার বাড়িতে আসেন এবং তাকে এবং তার ছেলেকে বাড়ি সমস্ত টাকা পয়সা এবং গয়না একটা সুটকেসে করে নিয়ে বেরিয়ে আসতে বলেন। তারা সেই রাতে বাড়ি ফেরেনি। পরেরদিন তাদের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাদের সারা শরীরে সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ এবং ছুরির খোঁচা পাওয়া যায়। তাদের সারা শরীর মেরে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য মাথায় গুলি করা হয়েছিল।

আজ এই লেখায় একজন কাশ্মীরি পন্ডিতের ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরবো। তাকে তিনবার অপহরণ করা হয় এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এখনও তিনি শ্রীনগরে থাকেন। পন্ডিত মশাইয়ের পড়ার খুব শখ। সারা বাড়িতে বই ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য বই তিনি সংগ্রহ করতে ভালোবাসেন।

১৯৯৫ সালে একদিন তিনি সাইকেল চালিয়ে মন্দির থেকে আসছেন, পথে এক মুসলিম প্রফেসার বন্ধুর সাথে দেখা। তিনি ওনাকে থামিয়ে বললেন, আরে তুমি এখানে কী করছো? অমুক স্থানে পন্ডিতদের ঘর থেকে চুরি করা বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই বিক্রি হচ্ছে। ভদ্রলোক সাইকেল চালিয়ে গিয়ে দেখে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বই এর পান্ডুলিপি ২০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। ভদ্রলোককে দেখে বিক্রেতা বললেন, আপনি মনে হচ্ছে পন্ডিত, আপনার থেকে ৩০ টাকা কিলো নেবো। তিনি বললেন আমি ১০০ টাকা কিলো দরে কিনবো, তুমি আমাকে সব বই দাও। সেখান থেকে পঞ্চদশ শতকের মহেশ্বরানন্দের মহারথমঞ্জরীর মতন বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের পান্ডুলিপি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

১৯৯৮ সালের ২৫এ জানুয়ারী কাশ্মীরের গান্দেরবালের পাশে কাশ্মীরি পন্ডিতদের গ্রাম ওয়ানধামা গ্রামে কিছু বন্দুকধারী আসে। তারা নিজেদের ভারতীয় সেনা বলে পরিচয় দেয়। তারা বলে যে তারা একটা রেডিও মেসেজের জন্য অপেক্ষা

করবে। সন্ধ্যে ৭টার সময় তারা গ্রামবাসীদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করে চলে যায়। এই ঘটনায় বিনোদ কুমার ধর নামে একটি ১৪ বছরের ছেলে বেঁচে গিয়েছিল। পরে হিজবুল মুজাহিদ্দিন-এর দায় স্বীকার করে।

সেইসময় কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার এসএল ভাট সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং তিনি বলেন যে এরকম হিংস্র ঘটনা তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি। পরেরদিন কাশ্মীরি পন্ডিতরা শ্রীনগরে বিক্ষোভ দেখান এবং Human Rights Commission (NHRC) এর ভিত্তিতে বিচার চায়। নিরস্ত্র কাশ্মীরি পন্ডিতদের জল কামান দিয়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে বহু নিরীহ মানুষ আহত হন। ডঃ অগ্নিশেখরকে গুরুতর আহত অবস্থায় AIMS-এ ভর্তি করা হয়। সারা পৃথিবীর কাশ্মীরি পন্ডিতরা এর তীব্র সমালোচনা করেন।

এই ঘটনার পর নর্থ আমেরিকান কাশ্মীরি ফোরাম এবং ইন্দো আমেরিকান কাশ্মীরি ফোরাম একটি প্রেস বিবৃতি দেন। "The significance of this massacre, coming on the eve of a national celebration and in the constituency of Dr. Farooq Abdullah, the Chief Minister, is a further indication of the evil designs by fanatic Islamic warriors armed and supported by Pakistan. But even more importantly, it undermines any claims by the Central government in Delhi or by the State government that normalcy is returning in Kashmir. Indeed, since the return of the elected government in the state, Kashmiri Pandits have been the targets of three massacres, one in Sangrampura (March 1997), the other in Gool Gulabagarh (June 1997), and now the latest massacre in Wandhama (January 1998)".....

১৯৯৮ সালের ১৯ জুন জম্মু কাশ্মীরের ডোডা জেলার চাপ্রানি গ্রামে একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক কাশ্মীরি পন্ডিতের বিয়েতে আশেপাশের গ্রামের কাশ্মীরি পন্ডিতরা একত্রিত হয়েছিল। রাতে কিছু অচেনা মানুষ এসে গুলি চালিয়ে হত্যা করেন বিয়ে বাড়িতে আগত সমস্ত অতিথি সহ বর বৌকে। লালকৃষ্ণ আদবানি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করলেও কোন ব্যবস্থা সেই হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি। পরে লস্কর এ তৈরা এর দায় স্বীকার করে।

এরপর কাশ্মীরে বহু গণহত্যা হয়েছে। ২০০০ সালে অমরনাথের নিরীহ যাত্রীদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। এই ঘটনায় ৮৯ থেকে ১০৫ জনের মৃত্যু হয়। একই সময় ডোডা, কুপওয়াড়া, কিস্তয়ার, কাজিমনগর, কায়ারে গণহত্যা চালিয়ে বহু কাশ্মীরি পন্ডিতকে হত্যা করা হয়, এদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে আগত শ্রমিকরাও ছিল।

২০০৬ সালের ৩০ এপ্রিল, কাশ্মীরের ডোডা জেলার কুলহান্দের কাশ্মীরি পন্ডিতদের গ্রাম খাওয়া গ্রামে রাতে কিছু অস্ত্রধারী এসে গ্রামবাসীদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলেন। গ্রামবাসীরা দাঁড়ালে, তাদের ওপর গুলি চালাতে থাকে। এই ঘটনায় একটা গ্রাম পুরো শেষ হয়ে যায়। যে ডাক্তারকে পোস্টমর্টেম করতে পাঠান হয়, এই দৃশ্য দেখে তার হার্ট অয়্যাটাক হয়ে মৃত্যু হয়। একইদিনে উধমপুর জেলার বসন্তগড়ের লালন গ্রামে একইভাবে হত্যা করা হয় কাশ্মীরি পন্ডিতদের।

লস্করে তৈবা এর দায় স্বীকার করে।

লেখা শেষ করার আগে আমি একটা কথাই বলবো, আমি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লেখা লিখি, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে না। কেউ যদি ভাবে আমি কোন ধর্মের বিরুদ্ধে লিখছি, সে দায় আমার না।

ওয়ান্ধামা হত্যার ঠিক এক বছর আগের কথা বলছি, সংগ্রামপুর গ্রামে থাকতেন অশোক কুমার পন্ডিত। গ্রামের চাষী অশোকের বৃদ্ধ বাবা সব সময় ছেলেকে বলতেন যেখানেই থাকো, সন্ধ্যের আগে বাড়িতে আসবে আর সন্ধ্যের পর কোথাও যাবে না। দিনটি ছিল ১৯৯৭ সালের ২১ মার্চ। সেদিন অশোক একটু তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গিয়েছিল। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ নিজের চাচীর চিৎকার শুনে ওপর থেকে বলে, চাচীর কিছু হয়েছে নাকি। চাচী বলেন তার ছেলে এখনো বাড়ি ফেরে নি, অশোক যদি একটু গিয়ে খুঁজে আনে। অশোক সিঁড়ি থেকে নেমে দেখে পাঁচজন বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে আছেন। একজনের হাতে লম্বা লিস্ট। সেই লিস্টে আট জন কাশ্মীরি পন্ডিতের নাম। সবাইকে ডেকে এনে লাইন করে দাঁড় করানো হয়। অশোক কেঁদে ফেলে, সে বলে তাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, তারা নিরীহ কৃষক কারুর কোন ক্ষতি করে নি, তারা কাশ্মীর ছেড়েও কোন দিন যায় নি। তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। এরপর দলের একজন বলে, তোরা যাসনি কেন এখান থেকে? নে এবার মর! গুলি চালিয়ে ৮ জনের শরীর ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়, রক্তে ভেসে যায় উঠান।

লেখার শেষে আবার বলবো, আমি সন্ত্রাসবিরোধী লেখা লিখি, ধর্মবিরোধী না।

—ঃঃ—

বঙ্গ কমিউনিস্ট

সমীর গুহরায়

(সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' রচনার সাদৃশ্যে আলোচ্য অংশটি রচিত। আঙ্গিকটুকুই শুধু অনুকরণ করা হয়েছে, বিষয়বস্তু রচনাকারের নিজস্ব)

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষি, আপনি বলিলেন কলিযুগে বঙ্গদেশে এক বিচিত্রবুদ্ধি মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবেক, যাহারা কমিউনিস্ট নামে পরিচিত হইবেন। তাহারা কিরূপ জাতি মনুষ্য হইবেন তা জানিতে বড় কৌতুহল হইতেছে। আপনি তাহাদের সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করিলে কৃতার্থ হই।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বলিলেন, হে রাজন, আমি সেই দেশদ্রোহী, বিজাতীয় কমিউনিস্টদের চারিত্রিক গুণাগুণ সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। যাহারা স্বদেশকে ঘৃণা করিবে, রাশিয়া চীনকে মাতৃভূমিজ্ঞানে ভক্তি করিবে, তাহারাই কমিউনিস্ট। যাহারা জ্ঞানে কম হইলেও লম্বচওড়া বাত বলিবেন, মিথ্যাচারে অদ্বিতীয় হইবেন তাহারাই কমিউনিস্ট। যাহারা মার্কস-লেনিনকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করবেন, স্বদেশীয় মনীষীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন, যাহাদের ধর্মগ্রন্থ হবে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো', তাহারা অবশ্যই কমিউনিস্ট। যাহারা নিজেদের অভ্রান্ত মনে করবেন, চালুনি হয়ে ছুঁচের বিচার করবেন তাহারা কমিউনিস্ট। রাজন, এরা হিন্দু হয়েও গোমাংস ভক্ষণ করিবেন, অথচ শূকরের মাংসের প্রতি এদের তীব্র ঘৃণা থাকিবে। গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতা থাকলেও নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করবেন। মিথ্যাচার এদের ঠোঁটস্থ হইবে।

রাজন, এইসব কমিউনিস্টদের চরিত্রে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে। বিজাতীয় কুকুরের লাথি খেলেও স্বজাতীয়কে গাল দিতে এরা ছাড়বে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলেও প্যাঁদানী খেলে ঈশ্বরের নাম গান করবেন। ধর্ম ইহাদিগের কাছে আফিমের ন্যায় হইলেও সেই আফিমে কখনও কখনও বুঁদ হইবেন। এরা অত্যন্ত ভোজন রসিক ও পানাসক্ত হইবেন। পানের পর সমস্ত কিছুকেই এরা লাল দেখিবেন। লাল হইবে ইহাদের প্রিয় রং।

রাজন, যাহারা বাক্যে এক, মনে আর এক; কার্যকালে আর এক হইবেন তাহারাই কমিউনিস্ট। যাহাদের অশ্রু মাত্রই কুম্ভীরাশ্রু, হাসি মাত্রই কপট ছলনা, তাহারা কমিউনিস্ট। যারা শ্রেণিহীন (বিদ্যাবুদ্ধিতে) হয়েও শ্রেণিসংগ্রামের বুলি আওড়াবেন, কৌটো নেড়ে পয়সা তুলে ফিস্টি করবেন, শ্রমিক-কৃষককে সাহায্যের নামে শোষণ করবেন তাহারাই কমিউনিস্ট। যাহারা চারপেয়ী না হয়েও লেজ বিশিষ্ট হবেন, বিজাতীয়কে তোষণ করবেন আর স্বদেশবাসীর পিছনে বাঁশ দেবেন তারাই কমিউনিস্ট। এরা প্রকৃত অর্থে কমরেড ('কম রেড' একটি দ্বিভাষী শব্দ বলে বিবেচিত হবে। বাংলার 'কম' এবং ইংরাজীর 'রেড' শব্দদ্বয় মিলে হবে কমরেড অর্থাৎ কম লাল) হবেন অর্থাৎ রক্ত লাল না হয়ে ফ্যাকাসে হবে। এরা বঙ্গদেশে আরশুলার জাত বলে পরিচিত হবেন এবং চিনা দেশে উপাদেয় খাদ্য বলে বিবেচিত হবেন।

তোষণের মন্ত্রে এরা দীক্ষিত হবেন। তোষণ করিতে ইহারা নিজের মা-বোনকেও ব্যবহার করিবেন। নিজেদের প্রলেতারিয়ান বললেও বিপথে অর্থ উপার্জন করিয়া টাকার কুমীর হইবেন। এজন্য তাহার কামাইনিষ্ঠ বলে সমালোচিত হইলেও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। স্বার্থপূরণে এরা তিন বাঁদরের নীতি (দেখিব না, শুনিব না, বলিব না) গ্রহণ করিবেন। কপটতায় এদের জুড়ি মেলা ভার হইবে। বিদেশী গুরুর (রাশিয়া-চীন) লাথি খেয়েও তাদের পদলেহন করবেন। দেশভাঙার ষড়যন্ত্র করবেন, জেহাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দেবেন; আবার জেহাদীদের হাতে বেদম প্রহার খেলে স্ত্রী আঁচলের তলায় লুকিয়ে কাঁদবেন এইসব বীর পুঙ্গবেরা। এদের ভয় থাকলেও লজ্জা ঘৃণা বলে কিছু থাকবে না। এদের কণ্ঠ থেকে অনর্গল বিষ ঝড়বে, মানুষ শোষণের নানা উপায় তারা বের করবেন, দরিদ্রের বন্ধু বলে ছলে-বলে দরিদ্রকে ঠকাবেন।

এতকিছুর পরেও এরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী বলে মনে করবেন এবং বিশ্বকে কমিউনিস্ট কারাগারে পরিণত করতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইবেন।

জনমেজয় দ্বৈপায়ন ঋষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মুনিবর, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এমন কিম্ভূতকিমাকার মনুষ্য কস্মিনকালেও ধরাধামে জন্মাইতে পারে, তা ভাবিয়াই আমার বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইতেছে। এদের কথা আর বেশি শুনিলে ইহজন্মে আমার আর পাপস্খলন হইবে না। আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

—ঃঃ—

গল্প

একাই একশ

ডাঃ অরুণকুমার গিরি

কয়েক বছর আগের কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট অঞ্চলের ঢোলা গ্রাম। প্রতিবছর বর্ষাকালে গোটা পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার ও ডি.ভি.সি থেকে ছাড়া জলের ফলে প্রায়ই সর্বত্র বন্যার আকার ধারণ করে। কিন্তু সেবারে যেন সব মাত্রা ছাড়ালো। চারিদিকে বন্যার জন্য সবকিছু তছনছ করে দিল। বহু কাঁচাবাড়ী জলের তলায়। জলের স্রোতে নদীর পাড় ভেঙ্গে হু হু করে জল ঢুকলো। পাকাবাড়ীও রেহাই পেল না। চাষবাস জলের তলায় ডুবলো, অনেকে জলের তোড়ে ভেসে গেল। দেওয়াল চাপা পড়া, বিদ্যুতস্পৃষ্ট হওয়া, সাপের কামড় খাওয়া কোন কিছুই বাদ গেল না। অনেক গরু বাছুর মরে পচে দুর্গন্ধ ছড়ালো। রাস্তাঘাট জলের তলায়। কাঁচারাস্তার অস্তিত্ব নেই বললে চলে। কেবল যেখানে যেখানে ইঁটের রাস্তা আছে সেগুলির অল্পকিছু যাতায়াত যোগ্য।

বন্যার পর প্রায় দু'মাস কেটে গেছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়। আকাশে পেঁজা তুলার মত মেঘগুলি ভেসে ভেসে চলেছে। কখনো বা ঐ মেঘ থেকে অল্প বিস্তর বৃষ্টিও হয়। দুপুর বেলা। ইঁটের ভাঙ্গা চোরা রাস্তা দিয়ে নুরুল সেখের রিক্সাটা জগদীশ বারিকের ছিটেবেড়া বাড়ীর একটু দূরে দাঁড়ালো। রিক্সা থেকে না নেমে নুরুল মিঞা জোর গলায় হাঁকলেন-অ্যায় জগা ঘরে আছিস? কোন উত্তর না পেয়ে মিঞা সাহেব রিক্সা থেকে নামলেন। জগার ঘরের দিকে একটু এগিয়ে আবার ডাকলেন-কিরে জগা শুনতে পাচ্ছিস না? এবার জগার বৌ মাথার ঘোমটা টেনে ঘরের বাইরে এলো। জিজ্ঞেস করলো-কিছু বলছিলেন বাবু? নুরুল মিঞা দেখলেন সামনে এক সতের-আঠারো বছরের তরতাজা বৌ। খুব হৃষ্টপুষ্ট চেহারা না হলেও তার একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য যেন ছড়িয়ে আছে। এই দেখে মিঞা সাহেবের শিকারী চোখ যেন চকচক করে উঠলো। জগদীশের বৌ-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে মিঞা সাহেব কিছু বলতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলো। জগদীশের ঘরের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ এলো। সম্ভবতঃ ঘরের তাক থেকে কোন বাসন পড়ে যাওয়ার শব্দে বউটি চমকে উঠতে তার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়লো। আর তখনই নুরুল মিঞার লোলুপ দৃষ্টি আরও জোরাল হলো। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে মিঞা সাহেব বললেন-

-জগাকে একটু ডেকে দাও তো, একটা কাজের কথা আছে।

-ও তো ঘরে নেই বাবু। সকালে পান্তা খেয়ে ঢোলা হাটের রহিম চাচার দোকানে মাল বইতে গেছে।

-কখন ফিরবে?

-দুপুরে ফিরবে, তবে একটু দেরী টেরি হতে পারে।

তখন বাইরে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে রিক্সায় না উঠে মিঞা সাহেব জগদীশের ঘরের উঠানের দিকে এগিয়ে এসে জগদীশের একটা ছোট চৌকির উপর বসে পড়লেন। জগদীশের বৌ সুমতি ততক্ষণে ঘরের ভিতর গিয়ে দরজার কাছে নিজেকে আড়াল করেছে। তা দেখে মিঞা সাহেব বলেলন- ঘরের ভিতর চলে গেলে কেন? সামনে এসো। জগা এলে তাকে আমার সাথে সন্ধ্যায় আমার কাচারী বাড়ীতে দেখা করতে বলো। কাল ভোরে গোডাউন থেকে রিলিফের মাল নিয়ে যেতে হবে।

-বাবু আপনাকে তো চিনি না। কি নাম বলবো?-সুমতি জিজ্ঞাস করে।

-বলবে ঢোলার গ্রাম প্রধানের চাচার ব্যাটা নুরুল সেখ বলেছে। -এই কথা বলে নুরুল সেখ জগদীশের ছিটে দেওয়া ঘরটার চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে জগদীশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রামু দাসকে বললেন-চল রামু ফেরা যাক। রামু গরীব রিক্সাওয়ালা। পেটের দায়ে বেশীরভাগই গরীব হিন্দুরা এলাকার অবস্থাপন্ন মুসলিমদের যেন কেনা গোলাম হয়ে আছে। রিক্সায় উঠতে গিয়েও তাতে না উঠে আবার জগদীশের ঘরের কাছে এসে হাঁক পাড়লেন-কোথায় গেলে মেয়ে? আমাকে এক গেলাস জল দাও তো। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। সুমতি মিঞা সাহেবের শকুন দৃষ্টি আঁচ করতে পারছিল। তাই ইতস্ততঃ করতে করতে সুমতি বললো-বাবু, আমরা খুবই গরীব। ছোট জাত। আমরা নাপিত বাবু। আপনাদের মত ভদ্দর লোকেরা আমাদের হাতে জল খাবেন?

-আমি কি তোমাদের বামুন নাকি যে ছোটলোকদের হাতে জল খাবো না। তুমি আমার মেয়ের মত। তোমার হাতে জল খাবো না কেন? যাও চট করে এক গ্লাস জল আনো। মিঞা সাহেবের মুখে মেয়ে সম্বোধন শুনে সুমতি নিজেকে বোঝালো যে সে হয়তো লোক চিনতে ভুল করেছে। তাই সাত পাঁচ আর

না ভেবে ভেতর থেকে কাঁচের গ্লাসে জল নিয়ে এলো। নুরুল মিঞা জলের গ্লাস নেওয়ার সময় ইচ্ছা করে সুমতির হাতে হাত ছোঁয়ালো। সুমতি ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। অগত্যা মিঞা সাহেব আর ওখানে বসে থাকার কোন অজুহাত পেল না। বাধ্য হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বললেন-জগাকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিও। এই বলে মিঞা সাহেব রিক্সায় উঠলেন।

মগরাহাটের ঢোলায় গরুর হাট বসে। সমগ্র এলাকার অধিবাসীরা মূলতঃ হিন্দু-মুসলমান। হিন্দুদের সংখ্যা কিছুটা বেশী হলেও মুসলমানদের দাপটে হিন্দুরা ভীত, সন্ত্রস্ত। ঢোলা হাটের চারপাশে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের বাড়ীঘরদোর অনেক কম। মোটামুটি কিছু অবস্থাপন্ন হিন্দুরা শান্তিতে বসবাস করার জন্যে অন্যত্র বাড়ীঘরদোর করে চলে যাচ্ছে। এলাকা ক্রমশই হিন্দু শূন্য হচ্ছে। যারা নিতান্তই গরীব তারা মুসলমানদের নানারকম অত্যাচার সহ্য করেও কোন রকমে মাটি কামড়ে পড়ে আছে। জগদীশ বারিক এমনই এক সহায় সম্বলহীন নিতান্ত এক নাপিত সম্প্রদায়ের লোক। সকালের দিকে সুযোগ পেলে জন-মজুরী খাটে আর বিকালে কোন কোন দিন ক্ষুর কাঁচি নিয়ে হাটের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে যৎসামান্য আয় করে। তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। বছর তিনেক আগে তার বিধবা মা ও সে এই দুইজনের সংসার ছিল। ঐ বছর প্রচুর বৃষ্টি ও ডি.ভি.সি-র ছাড়া জলে অনেক কাঁচা বাড়ী বন্যার জলে তলিয়ে যায়। জগদীশেরও মাটির ছোট বাড়ী ছিল। কিন্তু বন্যার জলে বাড়ীর দেওয়াল চাপা পড়ে মা মারা যায়। তারপর থেকে জগদীশ একা। সংসারে তার কেউ নেই বল্লে চলে। মাটিচাপা পড়ে মা মারা যাওয়াতে জগদীশ আর মাটির ঘর না বানিয়ে বাঁশের খুঁটি ও কঞ্চি দিয়ে ছিটেবেড়ার ঘর বানিয়েছে। মা মারা যাবার পর সে একরকম একা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন তার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব মিলে দক্ষিণ বারাসাতের সতীশ পরামানিকের বছর ষোল বয়সের ছোট মেয়ে সুমতির সাথে বিয়ে দেয়। ওদের এখনো কোন ছেলেপুলে হয় নি। সুমতি মুসলমান পড়শীদের মত হাঁস মুরগী ও ছাগল চরিয়ে, মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিয়ে সংসারে জগদীশকে সাহায্য করে। জগদীশ ও সুমতি দুজনেই যেন একে অপরের পরিপূরক। এইভাবে ওদের সংসার চলছিল।

> জগদীশ বৌকে আদর করতে গেলে, সুমতি স্বামীকে জানায়-দুপুরে যে লোকটি তোমার খোঁজে এসেছিল তার কথাবার্তা কেমন কেমন যেন, লোকটির চাউনিটা যেন গিলে খেতে চায়।

নুরুল সেখ ঢোলা পঞ্চায়েতের সদস্য ওসমান সেখের চাচার ব্যাটা। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি যেমন শক্ত হয় তেমনই পঞ্চায়েত সদস্যের খুড়তুতো ভাই হওয়ার সুবাদে নুরুলের প্রভাব প্রতিপত্তি তেমনই আকাশ ছোঁয়া। যতরকম দুষ্কর্ম করা সম্ভব কোনটাতেই তার খামতি যায় না। মেয়ে ফুসলানো, পাচার করা, চুরি-ডাকাতি-থানা পুলিশ সব কিছুতেই তাঁর হাত রয়েছে। রাজনৈতিক মদতে তারই দলবলের নুরুল-ই মাথা। ওসমান ও নুরুলের ভয়ে সবাই জুজু হয়ে থাকে। এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করার মত তল্লাটে কোন মরদ নেই। এহেন নুরুলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো জগদীশের বৌ সুমতির উপর যদিও সুমতিকে নুরুল সাহেব মেয়ে সম্বোধন করেছেন।

প্রায় অনেকেই জানেন যে, নরানাম্ নাপিতং ধূর্তঃ, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে নরসুন্দর বা নাপিত বেশী চালাক ও বুদ্ধিমান। কিন্তু জগদীশ একেবারেই তার উল্টো-সহজ সরল সাদাসিদে। ক্ষুর-কাঁচি-সাবান আয়নার বাক্স নিয়ে গ্রামে বেরুলেও ক্ষৌরকর্মে তেমন একটা আয় হয় না। তাই জগদীশকে মাঝে মাঝে অন্য কাজও করতে হয়। সে কখনো দিন মজুরী খাটে কখনো বা অন্যজনের গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হয়ে মালপত্র বয় দেওয়ার কাজ করে। দুপুরে জগদীশ বাড়ী ফিরলে সুমতি তাকে নুরুল সেখের কথা জানায়। কাজ পাওয়ার আশায় সন্ধ্যার সময় জগদীশ নুরুল সেখের কাচারীবাড়ীতে যায়। মিঞা সাহেব ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁর কর্মচারী জগদীশকে অপেক্ষা করতে বলে। জগদীশ কাচারীবাড়ীর দাওয়ার একধারে জুবুথুবু হয়ে বসে অপেক্ষা করতে থাকে।

বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতি বছরের মত সেবারেও পঞ্চায়েত প্রধানের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সদস্য ওসমান সেখ রিলিফ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ঢোলাতেই রিলিফ কেন্দ্র হয়েছে আর রিলিফের সব কাজকর্ম নুরুল সেখই দেখাশোনা করে। ফুড কর্পোরেশনের চাল, গম, ত্রিপল প্রভৃতি নুরুল মিঞার কাচারী বাড়ীর একটা গোডাউনে রয়েছে। হাতের কাজ একটু ফাঁকা হতে নুরুল মিঞা জগদীশকে ডেকে বলেন-আগামীকাল ভোরে আমার গোডাউন থেকে কয়েক বস্তা চাল, গম, ত্রিপ ল, গ্যামাক্সিন প্রভৃতি পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। ভোর চারটের আগে আমার এখানে চলে আসবি। আমার গোরুর গাড়ীতে করে মালগুলো নিয়ে যাবি। জগদীশ সম্মতি জানিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। সন্ধ্যার কিছু পরে

তাড়াতাড়ি করে খাওয়া দাওয়া সেরে বাতি নিবিয়ে জগদীশ ও সুমতি বিছানায় শুয়ে পড়ে। জগদীশ বৌকে আদর করতে গেলে, সুমতি স্বামীকে জানায়-দুপুরে যে লোকটি তোমার খোঁজে এসেছিল তার কথাবার্তা কেমন কেমন যেন, লোকটির চাউনিটা যেন গিলে খেতে চায়। কথা শুনে জগদীশ তার বৌকে সাহস জুগিয়ে বলে-বাপের বয়সী লোক, তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। এখন ঘুমোতে দাও, ভোরে আমাকে মিঞা সাহেবের কাচারী থেকে রিলিফের মাল নিয়ে যেতে হবে। এই বলে জগদীশ পাশ ফিরে অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ভোর ভোর উঠে জগদীশ যখন নুরুল সেখের কাচারী বাড়ীতে পৌঁছালো তখন চারটেও বাজেনি। তার আগেই পৌঁছে গেছে। নুরুল মিঞার পাতা ফাঁদে আর কিছুক্ষনের মধ্যে জগদীশের প্রিয়তমা প্রাণ পাখী করায়ত্ব হতে চলেছে এই আনন্দে কর্মচারীকে রিলিফের কি কি মাল পাঠানো হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে নুরুল মিঞা রিক্সায় তাড়াতাড়ি করে জগদীশের বাড়ীতে অভীষ্ট শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এবড়ো খেবড়ো ইঁটের এইটুকু রাস্তা যেন শেষই হচ্ছে না। মিঞা সাহেবের আর তর সইছে না। এদিকে আকাশে বেশ মেঘ জমেছে।

সব শুনে পঞ্চায়েত প্রধান সাহেব বললেন-আমার হাত পা বাঁধা, আমি এর প্রতিকার কোনভাবেই করতে পারবো না। পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে আসার আগে সুমতি জানিয়ে এলো-সমস্যাটা যখন আমার তখন আমাকেই সমাধান করতে হবে।

জগদীশ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ছিটে বেড়া ঘরের বাঁশের দরজা ভেজানো ছিল। দরজাটা লাগানো হয়নি। সুমতি ঘুমিয়েই পড়েছিল। মদ্যপ নুরুল মিঞাকে বেশী বেগ পেতে হয়নি। ভেজানো দরজা দিয়ে সন্তর্পণে ক্ষুধার্ত বাঘের মত মিঞা সাহেব সুমতির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুমতির কোন বাধাই টিকলো না। নুরুল তাকে চেঁটেপুটে খেলো। পরে বললো, কাউকে যদি এই ব্যাপার জানাস তাহলে তোর জগদীশকে একেবারে জানে খতম করে দেবো। এই বলে বাইরে এসে রিক্সাওয়ালাকে ডেকে বললেন চল রামু। একবার থানায় যেতে হবে। যতবার মিঞা সাহেব শিকার ধরতে পেরেছে, ততবারই রামুর ও থানার বড়বাবুর কিছু ভেট মিলেছে। মিঞা সাহেব খুবই পাঙচয়েল। এ দিকে এই আকস্মিক ঝড়ে সুমতি ভাবতেই পারছে না - কি ঘটনা ঘটে গেল! আলুথালু বেশে হতভম্বের মত উদাস দৃষ্টিতে বসে রইল।

নুরুল মিঞা একই কায়দাতে ভোরে জগদীশকে দূরে পাঠিয়ে অনেকবার সুমতির শরীরে থাবা বসিয়েছে। এই ব্যাপার কাউকে জানালে জানে খতম করে দেওয়ার হুমকি প্রতিবারই সুমতিকে প্রতিবাদী হতে বারণ করেছে। বাধ্য হয় সে কাউকে তার দুর্যোগের কথা কাউকে জানাতে পারেনি-এমন কি জগদীশকেও না। কিন্তু সুমতি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে বিষয়টা কাউকে জানাবার জন্যে। বাড়ীর কাছে দু-একজন পড়শী বৌ কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে বলে সুমতির মনে হয়েছে। তাই একদিন এই জঘন্য ব্যাপারটা সরমা নামে জগদীশের এক বৌদিকে জানায়। সরমা বেশ সাহসী মেয়ে হয়েও তেমন কোন জুতসই সমাধান খুঁজে পেল না। তাহলেও সরমা বললো-শয়তানের এই শয়তানী কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। ওর সম্পর্কে শুনেছি ও নানা মেয়ের সর্বনাশ করেছে। শুধু ঐ একা নয়, ওর দলের অনেকেই এইসব কুকর্মে লিপ্ত। যাই হোক এই কুকর্ম মুখ বুজে সহ্য করলে আমরা শেষ হয়ে যাবো। তুই এক কাজ কর, তুই তোর বাপের বাড়ী গিয়ে ব্যাপারটা তোর বাপ্ দাদাকে বল। তারা যদি কিছু করতে পারে। সরমার কথা শুনে সুমতি সায় দিতে পারলো না। বললো-আমি বাপ দাদাকে এর মধ্যে টানতে চাই না। বিপদটা আমার, আমাকেই সমাধান করতে হবে। তবে সরমাদি, যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও তাহলে তুমি আমার সাথে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে চল। সব ব্যাপারটা তাঁকে জানাবে। মনে হয় তিনি কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন, কেননা তিনি একজন হিন্দু। হিন্দু হয়ে তিনি মুসলমানদের এই হিন্দুদের প্রতি সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এ বিশ্বাস আমার আছে। সুমতি ও সরমার এই আলোচনার পরে দু দিন বাদে তারা পঞ্চায়ত প্রধানের কাছে লজ্জা সরমের কথা ভুলে গিয়ে সুমতি সবকিছু জানায়। সব শুনে পঞ্চায়েত প্রধান সাহেব বললেন-আমার হাত পা বাঁধা, আমি এর প্রতিকার কোনভাবেই করতে পারবো না। পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে আসার আগে সুমতি জানিয়ে এলো-সমস্যাটা যখন আমার তখন আমাকেই সমাধান করতে হবে।

এরপর প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে। নুরুল মিঞা সুমতির উপর কোন উপদ্রব করতে আসেনি। সুমতি ভাবলো পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নালিশ জানিয়ে বোধ হয় কাজ হয়েছে, আপদ বিদায় হয়েছে। তবুও সুমতি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। বাঘ একবার নরমাংসের স্বাধ পেলে তাকে ভুলতে পারে না, সুযোগ বুঝে আবার হানা দেয় লোকালয়ে। মাসখানেক বাদে নুরুল মিঞা লোক মারফৎ জগদীশকে ডেকে পাঠায় রিলিফের মাল

নিয়ে যাবার জন্যে। পরেরদিন জগদীশ আগের মত ভোরে বেরিয়ে যায়। সুমতি ভাবলো নুরুল মিঞা নিশ্চয়ই তার উপর আগের মতই অত্যাচার করবে। এই ভেবে সে নিজেকে প্রস্তুত করলো। জগদীশের চুল-দাড়ি কামানোর কাঠের হাত বাক্স থেকে সবচেয়ে ধারালো ক্ষুর নিয়ে নিজের বালিশের নীচে লুকিয়ে রাখলো। আর ঘরের বাঁশের দরজা ভেজিয়ে রেখে গাঢ় ঘুমের ভান করে নুরুল মিঞার আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলো। অনেক সময় কেটে গেল কিন্তু মিঞা সাহেবের দেখা নেই।

নুরুল নিজেকে বুঝিয়ে ছিল যে এত ঘনঘন সুমতির কাছে গেলে কেউ হয়তো সন্দেহ করতে পারে ও তাতে অনর্থক ঝামেলা হতে পারে। তার থেকে অন্য কোথাও শরীরের জ্বালা মেটানোর ব্যবস্থা করা মোটেই কষ্ট সাধ্য নয়। এই ভেবেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক নুরুল সুমতির বাড়ী আসেনি। এরপর দিন সাতেক বাদে রিলিফের মাল নিয়ে যাবার জন্য আবার জগদীশের ডাক আসে। আগের মতই ভোরবেলায় তাকে দূরে গরুর গাড়ীতে রিলিফের মাল পাঠিয়ে নুরুল মিঞা আতর মেখে চোখে সুর্মা লাগিয়ে পঞ্চান্ন বছরের জামাই সেজে আকণ্ঠ মদে চুর হয়ে সুমতির কাছে অভিসারে এলো। জগদীশ ভোরে বেরিয়ে গেলে সুমতি ধরে নেয় যে মিঞা সাহেব তার কাছে আসতে পারে। তাই মিঞা সাহেবকে আদর আপ্যায়ণ করার জন্য সুমতি প্রস্তুত হয়। বালিশের নীচে রাখা ক্ষুরটিকে খাপমুক্ত করে রাখে। বাঁশের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে গভীর ঘুমের ভান করে আগের মত সুমতি শুতে থাকে। এর কিছু পরে বাঁশের দরজা ঠেলার শব্দে সুমতি বুঝতে পারলো বাঘ জ্যান্ত মাংস খেতে খাঁচায় ঢুকেছে। আতরের ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে নতুন জামাইয়ের মত কপট ঘুমে আচ্ছন্ন সুমতিকে জাগালেন। সুমতি তাঁকে দেখে আদুরে গলায় জানালো-ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় আমাকে ভুলে গেলে। এতদিন আসনি কেন? কোথায় ছিলে? আমি ভোর রাত্রি থেকেই চাতক পাখীর মত হাপিত্যেশ করে তোমার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। আমাকে বুঝি আর তোমার মনে ধরে না? না অন্য কোথাও আমার থেকে স্বর্গের হুরী পেয়েছ নাকি? এই আবেগপূর্ণ ব্যবহারে নুরুল মিঞা হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। সুমতির কপট অভিমানে নুরুল মিঞা যেন স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হলেন। কিন্তু তার আগে সুমতির শরীর লুট করতে জন্মদিনের পোষাক পরে মিঞা সাহেব প্রস্তুত হয়ে সুমতিকে আদর করতে গেলেন। সুমতি এই মূহুর্তের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করে ছিল। মদ্যপ নুরুলের সে সময়ে কোন দিকে খেয়াল ছিল না। ঘরটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার ছিল। এই অবসরে সুমতি তার বালিশের নীচে রাখা উন্মুক্ত ধারালো ক্ষুর দিয়ে নুরুল সেখের গোপন অঙ্গটি মূহুর্তের মধ্যে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলো। আর-হা আল্লা মর গিয়া বলতে রক্তাক্ত অবস্থায় সুমতির ঘর থেকে প্রাণের দায়ে মিঞা সাহেব ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আর তখনই সুমতি চেতনাহীন হয়ে অস্ফুট স্বরে বললো -পেরেছি, প্রতিশোধ নিতে পেরেছি।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

এখনই আমার দুটি ক'রে ক্লাশের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাস ঐরূপ চলবে - তারপর ভারতে যাচ্ছি। কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে - আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি। আমি সব নূতন দেখতে চাই। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে হা-হুতাশ ক'রে আর প্রাচীনকালের লোকেদের কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে রাজী নই। আমার রক্তের যা জোর আছে, তাতে ঐরূপ করা চলে না। সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত স্থান, পাত্র ও সুযোগ কেবল আমেরিকাতেই আছে। আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থসথসে জেলি মাছের মতো ঐ বিরাট পিন্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ ক'রব - একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল - সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মা-এর মতো মা

এক ভদ্র মহিলা পাসপোর্ট অফিসে এসেছেন পাসপোর্ট করাতে।

অফিসার জানতে চাইলেন-আপনার পেশা কি?

মহিলা বললেন, আমি একজন মা।

আসলে, শুধু মা তো কোনও পেশা হতে পারে না।

যাক, আমি লিখে দিচ্ছি আপনি একজন গৃহিনী।

মহিলা খুব খুশি হলেন। পাসপোর্টের কাজ কোনও ঝামেলা ছাড়াই শেষ হলো। মহিলা সন্তানের চিকিৎসা নিতে বিদেশ গেলেন। সন্তান সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসলো।

অনেকদিন পরে, মহিলা দেখলেন পাসপোর্টটা নবায়ন করা দরকার। যে কোন সময় কাজে লাগতে পারে। আবার পাসপোর্ট অফিসে আসলেন। দেখেন আগের সেই অফিসার নেই। খুব ভারিক্কি, দাম্ভিক, রুক্ষ মেজাজের এক লোক বসে আছেন।

যথারীতি ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে অফিসার জানতে চাইলেন-

আপনার পেশা কি?

মহিলা কিছু একটা বলতে গিয়েও একবার থেমে গিয়ে বললেন-

আমি একজন গবেষক। নানারকম চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি। শিশুর মানসিক এবং শারিরীক বিকাশ সাধন পর্যবেক্ষণ করে, সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। বয়স্কদের নিবিড় পরিচর্যার দিকে খেয়াল রাখি। সুস্থ পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণে নিরলস শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভিত মজবুত করি। প্রতিটি মুহূর্তেই আমাকে নানারকমের চ্যালেঞ্জের ভিতর দিয়ে যেতে হয় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা মোকাবিলা করতে হয়। কারণ, আমার সামান্য ভুলের জন্য যে বিশাল ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

মহিলার কথা শুনে অফিসার একটু নড়ে চড়ে বসলেন। মহিলার দিকে এবার একটু শ্রদ্ধা আর বিশেষ নজরে তাকালেন। এবার অফিসার জানতে চাইলেন-

আসলে আপনার মূল পেশাটি কি? যদি আরেকটু বিশদভাবে বলতেন। লোকটির আগ্রহ এবার বেড়ে গেলো।

আসলে, পৃথিবীর গুণীজনেরা বলেন-আমার প্রকল্পের কাজ এতো বেশি দূরহ আর কষ্ট সাধ্য যে, দিনের পর দিন আঙুলের নখ দিয়ে সুবিশাল একটি দীঘি খনন করা নাকি তার চেয়ে অনেক সহজ।

আমার রিসার্চ প্রজেক্ট তো আসলে অনেকদিন ধরেই চলছে। সর্বক্ষণ আমাকে ল্যাবরেটরি এবং ল্যাবরেটরির বাইরেও কাজ করতে হয়। আহার, নিদ্রা করারও আমার সময়ের ঠিক নেই। সব সময় আমাকে কাজের প্রতি সজাগ থাকতে হয়। দুজন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীনে মূলত আমার প্রকল্পের কাজ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলছে।

মহিলা মনে মনে বলেন, দু'জনের কাউকে অবশ্য সরাসরি দেখা যায় না।

(একজন হলেন, আমার স্রষ্টা আরেকজন হলো বিবেক)

আমার নিরলস কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ আমি তিনবার স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছি। (মহিলার তিন কন্যা সন্তান ছিল)

এখন আমি সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আর পারিবারিক বিজ্ঞান এ তিনটি ক্ষেত্রেই একসাথে কাজ করছি, যা পৃথিবীর সবচেয়ে জটিলতম প্রকল্পের বিষয় বলা যায়। প্রকল্পের চ্যালেঞ্জ হিসাবে একটি অটিস্টিক শিশুর পরিচর্যা করে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলছি, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য।

'ঊষর মরুর ধূসর বুকে, ছোট্ট যদি শহর গড়ো,
একটি শিশু মানুষ করা তার চাইতেও অনেক বড়।'

অফিসার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মহিলার কথা শুনলেন। এ যেন এক বিস্ময়কর মহিলা। প্রথমে দেখেতো একেবারে পাত্তাই দিতে মনে হয়নি।

প্রতিদিন আমাকে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা আবার কোন কোন দিন আমাকে ২৪ ঘন্টাই আমার ল্যাবে কাজ করতে হয়। কাজে এতো বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, কবে যে শেষবার ভালো করে ঘুমিয়ে ছিলাম কোন রাতে, তাও আমার মনে নেই। অনেক সময় নিজের আহারের কথা ভুলে যাই। আবার অনেক সময় মনে থাকলেও সবার মুখে অন্ন তুলে না দিয়ে খাওয়ার ফুরসত হয় না। অথবা সবাইকে না খাইয়ে নিজে খেলে পরিতৃপ্তি পাই না। পৃথিবীর সব পেশাতেই কাজের ছুটি বলে যে কথাটি আছে আমার পেশাতে সেটা একেবারেই নেই। ২৪ ঘন্টাই আমার অন কল ডিউটি।

এরপর আমার আরও দুটি প্রকল্প আছে। একটা হলো বয়স্ক শিশুদের ক্লিনিক। যা আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচর্যা করতে হয়। সেখানেও প্রতি মুহূর্তে শ্রম দিতে হয়। আমার নিরলস কাজের আর গবেষণার কোনও শেষ নেই।

আপনার হয়তো বা জানতে ইচ্ছা করছে, এ চ্যালেঞ্জিং

প্রকল্প পরিচালনায় আমার বেতন কেমন হতে পারে।

আমার বেতন ভাতা হলো-পরিবারের সবার মুখে হাসি আর পারিবারিক প্রশান্তি। এর চেয়ে বড় অর্জন আর বড় প্রাপ্তি যে কিছুই নেই।

এবার আমি বলি, আমার পেশা কি?

আমি একজন মা। এই পৃথিবীর অতিসাধারণ এক মা।

মহিলার কথা শুনে অফিসারের চোখ জলে ভরে আসে। অফিসার ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। নিজের মায়ের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি খুব সুন্দর করে ফর্মের সব কাজ শেষ করেন, মহিলাকে নমস্কার করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। তারপর নিজের অফিস রুমে এসে একটি ধূসর হয়ে যাওয়া ছবি বের করে-ছবিটির দিকে অপলক চেয়ে থাকেন। নিজের অজান্তেই চোখের জল টপ টপ করে ছবিটির ওপর পড়তে থাকে।

আসলে ''মা''-এর মাঝে যেন নেই কোন বড় উপাধির চমক। নেই কোন পেশাদারিত্বের করপোরেট চকচকে ভাব। কিন্তু কত সহজেই পৃথিবীর সব মা নিঃস্বার্থ ভাবে প্রতিটি পরিবারে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। মাতৃত্বের গবেষণাগারে প্রতিনিয়ত তিলেতিলে গড়ে তুলেছেন একেকটি মানবিক নক্ষত্র।

সেই মা সবচেয়ে খুশি হন কখন জানেন-

যখন সন্তান প্রকৃতই মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে ধনে নয়, সম্পদে নয়, বিত্তে নয়, ঐশ্বর্যে নয় শুধু চরিত্রে আর সততায় একজন খাঁটি মানুষ হয়।

দুর্গা এসেছে

অভ্যুদয় মজুমদার

বইছে নদী, উড়ছে পাখি
কে এসেছে?
আরে ভাই দুর্গা এসেছে।

দুর্গা এল বাপের বাড়ি
মিষ্টি এল গাড়ি গাড়ি
ছুটছে ট্রেন, উড়ছে প্লেন,
কে এসেছে?
আরে ভাই দুর্গা এসেছে।

দুর্গা এলো, অসুর গেল
সবাই বলে ভালো হলো।
বাজছে গান, চলছে ভ্যান
কে চলেছে?
আরে ভাই দুর্গা চলেছে।

দুর্গা চলে বিসর্জনে
সবাই কাঁদে মনে মনে।।

হিন্দু সংহতি

হিন্দু ধর্ম করবে রক্ষা
হিন্দু সংহতি
আর যত সব হিন্দুর নামে
করছে রাজনীতি।
লড়ছে আজ সারা বাংলায়
হিন্দু সংহতি
সেই ভয়েতে নেতা মন্ত্রীর
সরছে পায়ের মাটি।
জীবন দিয়েও করবে লড়াই
হিন্দু সংহতি
মুসলিম তোষণ করব বন্ধ
এটাই প্রতিশ্রুতি।
দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে
হিন্দু সংহতির নাম
সবার মুখে উঠবে ধ্বনি
মা কালী শ্রী রাম।।

অবহেলিত হিন্দু

হিন্দু আজ অবহেলিত
খাচ্ছে শুধু ধোকা
মুসলিমদের মাথায় তুলে
দিচ্ছে ইমাম ভাতা।
পূজা পার্বণে পুলিশ দিয়ে
করছে লাঠিচার্জ
নেতা মন্ত্রী মসজিদে গিয়ে
পড়ছে সবাই নামাজ।
এমনি করে চললে এদেশ
পাল্টে যাবে নাম
আর কয়টাদিন সবুর করো
হবে পাকিস্তান।
জেগে ঘুমায় হিন্দুরা আজ
নাইকো কোন সাড়া
সবাইকে পরাবে টুপি
করবে সর্বহারা।।

জাগো হিন্দু জাগো

সুন্দরগোপাল দাস

ভারতের মুখ্য জাতি দু'টি
হিন্দু মুসলমান,
একটি হলো মানবীয়
অন্যটি শয়তান।

হাজার হাজার বছর আগে
ছিল হিন্দুদেরই বাস
জ্ঞান-গরীমা-সংস্কৃতি সেরা
তা সারা বিশ্বে প্রকাশ।

সত্যম-শিবম-সুন্দরম
ও মহান মানবতা
বিশ্ববাসী আত্মীয় সব
হিন্দুর মনের কথা।

নানান পন্থ, নানান মতে
বিরোধ কিছু নাই
পরধর্মে সহিষ্ণুতা শুধু
হিন্দুর বেলাতেই।

সবাই থাকুক সুখেও
নীরোগ হয়ে সবে,
সবার সাথে সাথী হয়ে
থাকুক দুঃখে সুখে।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে আজ
বিপদ আসে ধেয়ে
শত্রু মিত্র বোঝে না হিন্দু
বোকা সবার চেয়ে।

বাস্তবতায় বুদ্ধি শূন্য
আর আত্মরক্ষাহীন
ধর্ম নিরপেক্ষতার যাঁতায় হিন্দু
ধরায় হল লীন।

হিন্দু শৌর্য বীর্য আছে সবই
একতা কিন্তু নাই
সুযোগ বুঝে ইসলামীরা
নিয়েছে হেথায় ঠাঁই।

সম্পদ ভরা ভারত মাঝে
লুণ্ঠনেরই আশে
তেরশো বছর আগে আসে
তারা সন্ত্রাসেরই বেশে।

সেই সময় ভারত ছিল
হিন্দু ষাট কোটি
মুসলিম কালে কোতল হয়ে
রইল কুড়ি কোটি।

চেতনাহীন হিন্দুরা তাই
হারায় ধীরে ধীরে
যেমন হারিয়ে গেছে
ডাইনোসোর বিশ্ব মাঝারে।

হিন্দুর ধর্মের বিশালতা
ডাইনোসোরের মতো
অবচেতনায় হবে বিলীন
হিন্দু আছে যত।

জাগো জাগো ভাই হিন্দু সব
মরণ ঘুম ছাড়ি
এসো সবাই বিভেদ ভুলে
একসাথেতে লড়ি।।

চলে যাওয়ার পথে

অম্বিকা গুহরায়

বাঁধাধরা নয়তো পথ কোথায় আছে নদী-পর্বত
কোন্ দিগন্তের পারে
চিত্রপটে নয়কো আঁকা যে ছিল এই বুকে রাখা
কোথায় পাবো তারে।
কোথায় আছে শেষের সীমা ছুটে চলেছি কোন অজানা
সুদূরের-ই টানে
আঁধার রাতে প্রদীপ ঢাকা স্থির নয়নে চেয়ে থাকা
তোমার মুখ পানে।
জীবন আজ আঁধার কালো তোমায় তবু লাগে ভালো
স্মৃতি ভীষণ দায়
ভেবে না পাই কোন কথা বাজলো বীণা জাগলো ব্যথা
কি করিব হায়।
একবারও কি পড়ে না মনে সন্ধ্যাবেলা বাতায়নে
একলা বসে যখন তুমি রও
অবসরে, সকল কাজে আমাকে পাও হৃদয় মাঝে
নিজের সাথে কথা যখন কও।
প্রেম -সে তো বিধাতার দান মানুষই রাখে তার সম্মান
সত্যি প্রেম আজ মেলা ভার
একদিন সব অহং ভুলি কেঁদে কেঁদে ডাকবে তুমি
সেদিন আমি আসব না তো আর।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে
১৬ই আগস্ট হিন্দু সংহতির মহামিছিলে পা মেলালো হাজার হাজার মানুষ

বাধা-বিপত্তি ছিল অনেক। কিন্তু দমিয়ে দেওয়া যায়নি হিন্দু সংহতি তথা তার কর্ণধার তপন ঘোষকে। গোপাল মুখার্জী স্মরণ দিবস উপলক্ষে ১৬-ই আগষ্ট কলকাতার রাজপথে হিন্দু সংহতির মহামিছিল তার প্রমাণ। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রা ৭-৮ হাজার কর্মী সমর্থক এই মহামিছিলে যোগদান করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন গোপাল মুখার্জীর সুযোগ্য নাতি শ্রী শান্তনু মুখার্জী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাশ্মীরি হিন্দুদের অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করা সংগ্রামী যোদ্ধা সুশীল পন্ডিত। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও আলিপুর কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোট শান্তনু সিংহ। মহামিছিল রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু করে হেদুয়া পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

এ বছরই দেশভাগের ৭০ বছর। সেই যন্ত্রনাদায়ক ইতিহাস আপামর বাঙালীর সামনে তুলে ধরতে এবং ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গায় হিন্দুর মান-সম্মান ও জীবন রক্ষাকারী হিন্দুবীর গোপাল মুখার্জীর আত্মত্যাগকে স্মরণ করতে হিন্দু সংহতি ব্রতী হয়। ঠিক হয়, পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের বিভিন্ন অংশের জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউড্' হলে একটি সেমিনার মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। সেই মত হল-ও বুক করা হয়। কিন্তু কোন সঠিক কারণ না জানিয়ে হল কর্তৃপক্ষ হিন্দু সংহতির পোগ্রাম বাতিল করে। এর পিছনে কোন অশুভ চক্রান্ত আছে বলেই তপন ঘোষ মনে করেন। হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি। তপন ঘোষের নির্দেশে পথে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য সরকার বা প্রশাসন থেকে সরাসরি কোন পারমিশন হিন্দু সংহতিকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু সমস্ত রকম চ্যালেঞ্জ নেওয়া যাঁর কাজ, সেই তপন ঘোষ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মহামিছিলের অগ্রভাগে থেকে প্রমাণ করলেন, তাঁকে এবং তাঁর সংগঠনকে এভাবে দমানো যাবে না।

বেলা ২টোয় সুশীল পন্ডিত ও শান্তনু মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ মহামিছিলের শুভ সূচনা করেন। মিছিল শুরুর আগে হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণ কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকলেও মিছিলে তারা কোন রকম বাধা দেন নি। মিছিল বৌবাজার, রাজা রামমোহন রায় সরণী হয়ে বেলা সাড়ে তিনটের সময় হেদুয়া পার্কে পৌঁছায়। সেখানে একটি গাড়িতে মঞ্চ হিসাবে আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

সংহতির সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, রাজনীতির দ্বারা হিন্দুর সমস্যার সমাধান হবে না। হিন্দুকে আপন শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে, তার জন্য চাই একটা মঞ্চ-আর সেই মঞ্চ হল হিন্দু সংহতি। শান্তনু সিংহ দেশভাগ ও তার ফলে উদ্ভূত সমস্যার জন্য কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের দায়ী করেন। গোপাল মুখার্জীর নাতি শান্তনু মুখার্জী বলেন, সেদিন হিন্দুর জীবন, ধন-মান রক্ষার জন্য তাঁর দাদু হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তিনি কোন গুন্ডা ছিলেন না। কিন্তু বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস বিকৃত করে হিন্দুবীর গোপাল মুখার্জীকে গুন্ডা আখ্যা দিয়েছে। পানুন কাশ্মীরের যোদ্ধা কাশ্মীরি পন্ডিত সুশীল পন্ডিত তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই তপন ঘোষকে ধন্যবাদ জানান তরুণ বাঙালী হিন্দু যুবকদের ধর্মরক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য। তিনি কাশ্মীরের সমস্যাকে আজ সারা ভারতের সমস্যা বলে উল্লেখ করেন। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, দিকে দিকে হিন্দুরা আজ জাগছে। এতদিন শুধু 'মারা' হত, এবার মারামারি হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সেখানে হিন্দুরা শুধু মার খায়নি, প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথে হেঁটে পাল্টা মার দিয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে এই জাগরণের কাজটুকুই গ্রামে গ্রামে হিন্দু সংহতি

করে চলেছে। তিনি মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন বাদুড়িয়ায় আক্রান্ত হিন্দুদের সাহায্য করবে হিন্দু সংহতি। মুসলিম লাভ জেহাদী আক্তার আনসারির লালসার শিকার সোনামনি হেমব্রম ও তার অনাথ পুত্রের পাশে থেকে তাদের সমস্তরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হিন্দু সংহতির সহসভাপতি সমীর গুহরায়।

মহামিছিলে বিশিষ্টজনদের সঙ্গে পা মেলান কেন্দ্রীয় কমিটির দেবতনু ভট্টাচার্য, দেবদত্ত মাজি, সুজিত মাইতি, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, চিত্তরঞ্জন দে, সুন্দরগোপাল দাস, পীযূষ মন্ডল, দেব চ্যাটার্জী, সাগর হালদার, সমীর গুহরায় প্রভৃতি সদস্যরা।

উত্তরবঙ্গের হিন্দু সংহতির ত্রাণ বিতরণ

প্রবল বর্ষণ ও ডিভিসি জল ছাড়ায় এবার উত্তরবঙ্গ-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে প্রবল বন্যা দেখা দেয়। দক্ষিণবঙ্গের হিন্দু সংহতির কর্মীরা স্থানীয়ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতিতে বিপর্যয়ের আকার ধারণ করে। হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি উত্তরবঙ্গে ত্রাণ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। গত ১৯শে আগষ্ট, শনিবার সকালে শুভাশীষ সরকার, ভাস্কর ঘোষ ও তাপস ভট্টাচর্যের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ২০শে আগষ্ট মালদার গাজল থানার অন্তর্গত পাহাড়িভিটা গ্রামে লালন কোড়া ও টোটন কোড়ার নেতৃত্বে ত্রাণ কার্য চালান হয়। উল্লেখ পাহাড়িভিটা গ্রামটি আদিবাসী অধ্যুষিত। সংহতি-র আগে এই আদিবাসী মানুষগুলোর দিকে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। এরপর স্থানীয় কর্মী অভিজিৎ ও স্নেহাশিষের নেতৃত্বে মালদার পাকুয়ার, আদাডাঙা, সনঘাট, নোয়াপাড়া, পাকুদাহ, হাঁসপুকুর প্রভৃতি জায়গায় ত্রাণ পাঠানো হয়। প্রোহ্লাদ, সাগর, সঞ্জয়-এর নেতৃত্বে মালদার গাজোল থানার পাবনা পাড়া গ্রাম, সব্যসাচী দাসের নেতৃত্বে ওল্ড মালদা ব্লকের বিভিন্ন

জায়গায়, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রমুখ কর্মী শঙ্কু বর্মন, তাপস, বাপ্পা ও প্রমিথের নেতৃত্বে করণদিঘি, বাউলের গোরাহাট ও শিবপুর গ্রামে সংহতির পক্ষ থেকে ত্রাণকার্য চালান হয়। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ জানান, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি ভয়ানক। অধিকাংশ জেলাই জলমগ্ন। এই অবস্থায় সীমিত সামর্থ নিয়ে হিন্দু সংহতি বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ কার্য চালিয়েছে। যেসব সংহতি কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্গম অঞ্চলে মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে, তাদের বাহাদুরিকে তিনি শাবাসী জানান।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

দুষ্কৃতি তাণ্ডব হাওড়ার ডোমজুড়ে

দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল হাওড়ার ডোমজুড় অঞ্চল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নামলেই ডোমজুরের রথতলা থেকে বালুহাটি পোল পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একদল দুষ্কৃতি। এরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলে জানা গেছে। ওদের কারো হাতে লোহার রড, কারো হাতে চেলাকাঠ বা সাইকেলের চেন। নিরীহ পথচারীরা হল ওদের শিকার।

বাইকে চড়ে এরা এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পথচারীদের মারধোর করে তাদের মালপত্র, টাকাপয়সা কেড়ে নিচ্ছে। কোচিং ফেরত ছাত্র-ছাত্রী থেকে অফিস ফেরত মানুষজন এদের প্রধান টার্গেট। ওদের মারে অনেক মহিলা বা বাচ্ছা ছেলে মেয়ে দারুণভাবে আহত হয়েছে। বৃদ্ধরাও বাদ যায় নি। পুলিশে জানিয়্যে কোন লাভ হয়নি। উল্টে টহলরত পুলিশ বাধা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতিদের হাতে মার খাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আত্মহত্যা করে মুক্তি পেল লাভ জেহাদের শিকার রিম্পা পাল

আবার লাভ জেহাদের বলি হল একটি হিন্দু মেয়ে। এবারের ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার, শ্যামনগর রামমোহন পল্লী। মেয়েটির নাম রিম্পা পাল। বয়স মাত্র ২০ বছর। গত ১৫ই আগষ্ট সকালে, নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করার আগে শেষ জবানবন্দীতে জনৈক সুরজকে তার এই চরম সিদ্ধান্তের জন্যে দায়ী করে রিম্পা এবং তার ফাঁসির দাবী করে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে হিন্দু নামধারী সুরজের আসল নাম আহেদ আলি। রিম্পাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। রিম্পার পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ আহেদ আলিকে গ্রেফতার করলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে রিম্পার পরিবারকে এফআইআর করতে দেয়নি বলে জানতে পারা গেছে। আহেদ আলির পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাবের কথা চিন্তা করে কেসটি ইচ্ছাকৃতভাবে হালকা করে দেওয়ার আশঙ্কা করছে রিম্পার পরিবার। যাতে তারা কোনরকম অভিযোগ না করে সেই ব্যাপারেও তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন সবকিছু জানা সত্ত্বেও নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে।

ইভ টিজিংকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র দাঁতনের শিয়ালশাই

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন বিধানসভার মোহনপুর থানার অন্তর্গত শিয়ালশাই গ্রাম। এই গ্রামেরই একটি স্কুল শিয়ালশাই শ্রীপতি স্কুল শুরু বা ছুটির সময় নিকটবর্তী আটলা গ্রাম থেকে মুসলিম যুবকেরা এসে প্রায়শই হিন্দু মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, গত ২৪শে আগষ্ট জনৈক শেখ রাজু, পিতা শেখ রিয়াসুদ্দিন স্কুলের হিন্দু ছাত্রীদের উত্যক্ত করতে থাকে। এতে স্থানীয় হিন্দুরা বাধা দিলে শেখ রাজু তাদের এলাকা থেকে শ'খানেক মুসলিম নিয়ে এসে এলাকার বিভিন্ন দোকানে হামলা করে। তাদের হামলায় বলরাম দাসের চায়ের দোকান, পল্টু মাইতির দোকান, বীরেন দাসের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুষ্কৃতিদের আক্রমণে বীরেন দাসের বৃদ্ধা মা প্রাণ হারান। কালিপদ মাজি ও মনীন্দ্র নাথ বেড়ার সম্পত্তিও ভাঙচুর করা হয় বলে জানা গেছে। এরপর হিন্দুরা স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তাঁদের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

মসজিদে লাউডস্পিকার নিষিদ্ধ করল চীন

চীনের হুয়ালং হুই প্রদেশে মাসজিদে লাউডস্পিকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করল সে দেশের সরকার। সেই প্রদেশে তিনদিনে তিনশো মসজিদ থেকে প্রায় একহাজার লাউডস্পিকার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। চীনা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শব্দদূষণের কারণেই লাউডস্পিকারগুলি খুলে ফেলা হয়েছে। এর আগেও চীনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষ থেকে এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন আজানের সময় লাউডস্পিকারের ব্যবহারে তারা বিরক্ত হচ্ছেন। বারবার অনুরোধেও নাকি লাউডস্পিকারের শব্দ কমানো হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মুসলিমদের একটা বড় অংশ রীতিমতো ক্ষুব্ধ এই সিদ্ধান্তে। তাদের বক্তব্য, এটা সরাসরি ধর্মচারণের অধিকারের ওপরে সরকারি দমননীতি। কোনও সরকার কখনই এভাবে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপরে এভাবে কর্তৃত্ব জাহির করতে পারে না।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

গাজোল থানা ঘেরাও করে আদিবাসী সমাজের প্রতিবাদ

দীর্ঘদিন ধরে লাভজেহাদের শিকার উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজ-এর মহিলারা। তাদের অশিক্ষা ও দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম যুবকেরা প্রেমের ফাঁদ পেতে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ধর্মান্তরিত করে চলেছে। এমনই এক লাভ জেহাদের শিকার সোনামণি হেমরম। কাজ দেওয়ার নাম করে ভিন্ন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে সোনমণির সঙ্গে সহবাস এবং পরবর্তীতে বিয়ে করে ধর্মান্তকরণ করার অভিযোগ উঠল এলাকার ছেলে রাজুর বিরুদ্ধে, যার প্রকৃত নাম আক্তার আনসারী।

নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগ, নাম ভাঁড়িয়ে, নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে আক্তার তার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করে। পরে সে অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়লে রাজু তাকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সোনামণি জানতে পারে যে তার স্বামী মুসলমান এবং তার স্ত্রী সন্তান আছে। সোনামণিকেও মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে এবং রোজা রাখা, কলমা পড়তে জোর করা হয়। সোনামণি রাজি না হলে তার উপর চলে পাশবিক অত্যাচার।

শেষ পর্যন্ত সোনামণি সেখান থেকে পালিয়ে আসে। হিন্দু সংহতির সহায়তায় গাজোল থানায় সে আক্তার আনসারীর নামে জালিয়াতি ও জোর করে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ এনে

কেস দায়ের করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গাজোল থানার পুলিশ আক্তার আনসারীকে গ্রেফতার করে।

কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি আদিবাসী সমাজ। গত ২৪শে আগষ্ট তারা গাজোল থানা ঘেরাও করে দুষ্কৃতির কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের এই বিক্ষোভে এলাকার সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছিল। অবশেষে পুলিশি আশ্বাসে থানা ঘেরাও মুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, কঠোর শাস্তি তো দূরের কথা, ২৯ তারিখ আক্তার আনসারিকে কোর্টে তোলা হলে সে জামিন পেয়ে যায়।

উলুবেড়িয়ার বেলতলাতে মুসলমানের হাতে আক্রান্ত শ্মশান ফেরত যাত্রীরা

প্রিয়জনের সৎকার করে ফেরার পথে যে মুসলিমদের হাতে বেধড়ক মার খেল হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বেলতলার হিন্দুরা। দুখে মন্ডল (২৪), সরস্বতী মন্ডল (২০), গুড্ডু মন্ডল (২০) কমলা মন্ডল (৪৫) সকলেই শ্মশান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বেলতলা মোড়ের কাছে মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এদের সকলকেই রড, লাঠি ও শাবল দিয়ে মারধর করা হয়। দুষ্কৃতকারীরা হল রামপ্রসাদ গাজী (ধর্মান্তরিত মুসলিম), রাজা গাজী, সোনা গাজী ও মিদ্দে। পরে স্থানীয়রা এদের উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুড্ডুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দুখে মন্ডলের পায়ে শাবল দিয়ে খোঁচা মারার ফলে তার আঘাত গুরুতর, তাই তাকে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাতে রেফার করা হয়। সে বর্তমানে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি। ডাক্তাররা জানিয়েছে তার একটি পা হাঁটু থেকে বাদ দিতে হতে পারে। আক্রান্তের পরিবার এখনো থানায় অভিযোগ করেনি। প্রিয়জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে তারা থানায় অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

উলুবেড়িয়ায় শ্লীলতাহানির শিকার নাবালিকা

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত মুসাপুর গ্রামের নাবালিকা সুমিতা ঢুলি (নাম পরিবর্তিত, পিতা-মৃত পূর্ণ ঢুলি) স্থানীয় গুদার আপার প্রাইমারী স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। গত ২৩শে আগষ্ট সে যখন স্কুল থেকে ফিরছিল তখন স্থানীয় বেশ কয়েকজন মুসলিম যুবক তাকে রাস্তার পাশের ঝোপে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। তার শ্লীলতাহানি করে। বড়ো কিছু ঘটে যাবার আগে সুমিতার চিৎকারে লোকজনেরা ছুটে আসে এবং দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়া থানায় এফআইআর দায়ের করেন (এফআইআর নম্বর-৬৮১/২০১৭)। সুমিতা যে সমস্ত দুষ্কৃতকারীর নাম জানিয়েছে তারা হল-রাজ খাঁন (পিতা-জাহাঙ্গীর) ও ইকবাল খাঁন (পিতা-মৃত নিয়ামত আলি)। পুলিশ দুষ্কৃতিদের খোঁজে তল্লাশি চালালেও এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

প্রায় দশ বছর পর মুক্তি পেলেন কর্নেল পুরোহিত

সোমবার ২১শে আগষ্ট, মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিতকে জামিন দিলো সুপ্রিম কোর্ট। বিচারক আর কে আগরওয়াল ও বিচারক এ এম সাপ্রে-এর গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ তাদের রায়ে বোম্বে হাইকোর্টের রায়কে বাতিল ঘোষণা করে। কোর্ট আরো বলেন যে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র করে কাউকে জেলে আটকে রাখা যায় না। কারণ হিসেবে রায়ে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে সাক্ষীদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল পুরোহিতের বিরুদ্ধে বয়ান দিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ২০০৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মালেগাঁও-তে বিস্ফোরণে সাত জনের মৃত্যু হয়। পরে মহারাষ্ট্র এটিএস (ATS)। সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, কর্নেল পুরোহিত ও আরো নয়জনকে গ্রেফতার করে। পরে এনআইএ তদন্ত করে এবং ৪,০০০ পাতার চার্জশিট দেয় কর্নেল পুরোহিত, সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর ও স্বামী দয়ানন্দ-এর বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে গত বছর সধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত দেয় এনআইএ।

আরমান আলির লালসার শিকার প্রতিবেশী নাবালিকা

এক হিন্দু নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হল প্রতিবেশী মুসলিম নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে বিরাটির নাইকুড়ি মোড়ে। অভিযুক্তের নাম আরমান আলি মন্ডল (১৫) ওরফে রামিজ। অভিযোগ আরমান প্রতিবেশী ৯ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। শনিবার (২৯শে আগষ্ট) ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিমতা থানার পুলিশ। অভিযোগ শুক্রবার রাতে ওই নাবালিকাকে লুকোচুরি খেলার নাম করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় আরমান। অনেকক্ষণ কেটে গেলেও বাড়ি না ফেরায় মেয়েটির দাদা তাকে খুঁজতে বের হয়। সে দেখে তার বোন আরমানের বাড়ির পিছনে পড়ে কাতরাচ্ছে। সে রক্তাক্ত অবস্থায় বোনকে বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়ি ফিরে ওই অবস্থাতে মেয়েটি সমস্ত ঘটনা জানায়। শনিবার নিমতা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। আরমানকে গ্রেফতার করা হয়। আরমানের বাবা উত্তর দমদম পুরসভার কর্মী। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগে নিগৃহীতার মেডিকেল টেস্ট হয় নি। পরিবারকে অভিযোগের কেস নম্বর দেওয়া হয়নি।

নামাজের স্থানে সাড়ে ৪ বছরের শিশু ধর্ষণ করল ইমাম

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কাহারোল উপজেলায় অবস্থিত কাহারোল মাদ্রাসায় সাড়ে ৪ বছরের একটি অবুঝ শিশু কন্যাকে ধর্ষণের দায়ে নশিপুর গম গবেষণা কেন্দ্র মসজিদের ইমাম ও খোশালপুর ফোরকানীয়া মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মো. সাখাওয়াত হোসেনকে (৪২) গ্রেফতার করেছে কাহারোল থানা পুলিশ।

গত ২৪শে আগষ্ট সকাল ৬টার দিকে কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দপপুর ইউনিয়নের গড়নুরপুর গ্রামের খোশালপুর ফোরকানীয়া মাদ্রাসার ভেতরের নামাজ পড়ার স্থানে ইমাম সাখাওয়াত আরবী পড়ানোর নাম করে শিশুটিকে কোলে বসিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিজের ও শিশুটির পরনের কাপড় সরিয়ে কোলে বসিয়ে বিকৃতি চালাচ্ছিলেন ওই সময়। কিন্তু অবুঝ শিশুটি ব্যাথার চোটে চিৎকার করে ওঠায়, তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন সাখাওয়াত। সেই সাথে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কান্না থামানোরও চেষ্টা করেন এই নরাধম ইমাম। কাহারোল থানার অফিসার ইনচার্জ মো. আইয়ুব আলীর নিকট এভাবেই ইমাম সাখাওয়াত পুরো ঘটনা স্বীকার করেছেন। ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন থানার অফিসার ইনচার্জ।

ঘটনার বিবরণ থেকে আরও জানা গেছে, ধর্ষণের চেষ্টার পর শিশুটি বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবাকে ঘটনাটি বলে দেয়। ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকায় লোকজন এসে ধর্ষক সাখাওয়াত হোসেনকে বেদম মারধর করে। পরে কাহারোল থানায় খবর দিলে থানার এসআই আনোয়ার হোসেন ফোর্স-সহ ঘটনাস্থলে গিয়ে সাখাওয়াতকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল বলে কাহারোল থানা অফিসার ইনচার্জ মো. আয়ুব আলী জানিয়েছেন। জানা গেছে, ধৃত সাখাওয়াত হোসেন জয়পুর হাট জেলার পাঁচ বিবি উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত ফয়েজউদ্দীনের পুত্র।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

বাদুড়িয়া দাঙ্গার মূল পাণ্ডা মেজকাতুর রহমানকে গ্রেফতার করল পুলিশ

গত ১৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার বসিরহাট থানার পুলিশ বাদুড়িয়াতে হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা বাধানোর দায়ে অভিযুক্ত তিনজনকে খোলাপোতা থেকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে মূল পাণ্ডা মেজকাতুর রহমানকে পুলিশ বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁজছিলো। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেজকাতুর বসিরহাটের ত্রিমোহিনী এলাকার বাসিন্দা। সে ও তার দলবল সক্রিয়ভাবে বাদুড়িয়ার হিন্দুবিরোধী হিংসায় অংশ নিয়েছিল। সে আগে বসিরহাট কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা ছিলেন। বর্তমানে সে বাসিরহাটের টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক। বাদুড়িয়া দাঙ্গার আগুন বসিরহাটে মেজকাতুর রহমানই নিয়ে আসেন বলে পুলিশের দাবি। উল্টোরথের দিন কয়েকশো জিহাদিকে নিয়ে মেজকাতুর রহমান রথ উল্টে দেবার পাশাপাশি দোকান, বাজার ও বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালান। আক্রান্ত হয় পুলিশ ও সংবাদমাধ্যম। তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনার পর থেকে মেজকাতুর ও তার কয়েকজন সঙ্গী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে তারা ফিরে এলে পুলিশ কোলাপোতা থেকে তাদের গ্রেফতার করে। শুক্রবার, ১৮ই আগষ্ট মেজকাতুর ও তার সঙ্গীদেরকে বসিরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদেরকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জঙ্গিদের এ দেশে ঢোকার নতুন রাস্তা মুর্শিদাবাদের রামনগর

মুর্শিদাবাদের রামনগর এখন জঙ্গি সংগঠনগুলি নতুন করিডর। নব্য জেএমবি এবং আইএসের বাংলাভাষী উইংয়ের সদস্যরা এই এলাকা দিয়েই বারবার বাংলাদেশ থেকে এ দেশে আসছে এবং ফিরেও যাচ্ছে। তাদের সাহায্য করছে বেশ কিছু স্থানীয় বাসিন্দা। তাদের হাত ধরেই জেহাদিরা পেয়ে যাচ্ছে ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের পরিচয়পত্র। খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে অভিযুক্ত হাতকাটা নাসিরুল্লা ধরা পড়ার পর এই তথ্য পেয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)।

বাংলাদেশ পুলিশের হাতে বন্দি রয়েছে খাগড়াগড়কাণ্ডে অন্যতম মূল অভিযুক্ত হাতকাটা নাসিরুল্লা। ধরা পড়ার পর তাকে জেরা করে এসেছেন এনআইএ-র একটি তদন্তকারী দল। রাজ্যে নব্য জেএমবির শিকড় কোথায় কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে, কারা সংগঠনের হয়ে কাজ করছে এবং স্থানীয়দের কী রকম সাহায্য মিলছে, তা নিয়েই মূলত জেরা করেন আধিকারিকরা। তখনই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, ২০০৪ সাল থেকে এ রাজ্যে যাতায়াত করেছে হাতকাটা নাসিরুল্লা। মুর্শিদাবাদে জেএমবির ঘাঁটি থাকায় সহজে যাতে সীমান্ত পেরিয়ে এখানে আসা যায়, সেই রাস্তা খুঁজছিল নাসিরুল্লা। স্থানীয় কয়েকজন তাকে জানায়, মুর্শিদাবাদের রামনগর এলাকা পারাপারের পক্ষে অত্যন্ত নিরাপদ। এই কাজে তাকে সাহায্য করত ৩ জন। যাদের নিয়মিত বাংলাদেশে যাতায়াত রয়েছে। এজন্য মোটা অঙ্কের টাকা পাচ্ছে তারা। নাসিরুল্লার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সে নব্য জেএমবিতে যোগ দেওয়ার পরও এই রুটেই ব্যবহার করেছে। জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে নতুন করিডর হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের রামনগর। জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও ওপার বাংলা থেকে এই পথেই আসছে আগ্নেয়াস্ত্র। এরাজ্য ছাড়াও নব্য জেএমবি'র সদস্যরা অন্যত্র যেসব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাদের কাছে যাচ্ছে এসব। নাসিরুল্লার কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়ার পর এনআইএ-র তদন্তকারী একটি টিম মুর্শিদাবাদে যায়। জেলা পুলিশের সঙ্গে এই নিয়ে কথাও বলে তারা। এরপর স্থানীয় পুলিশকর্তাদের সঙ্গে নিয়েই ওই এলাকায় যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারীকরা। জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যদের পারাপারে সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে যাদের বিরুদ্ধে, তাদের খোঁজ করা হয়। কয়েকজনের সঙ্গে এলাকাতেই কথা বলেন তাঁরা। পরে দু'জনকে এনআইএ অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। নাসিরুল্লার সঙ্গে তাদের পরিচয়ের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। তাদরে জেরা করার পর তদন্তকারী অফিসাররা নিশ্চিত, পারাপারে সাহায্য করা ব্যক্তিদের সঙ্গে এ রাজ্য ও সীমান্তের ওপারের জঙ্গি গোষ্ঠীর বড় মাপের নেতাদের যোগাযোগ রয়েছে বলে কিছু প্রমাণ এসেছে আধিকারিকদের কাছে। একাধিকবার তাদের ফোনও গিয়েছে বাংলাদেশে। নাসিরুল্লা ছাড়াও নব্য জেএমবি'র বিভিন্ন নেতাকে তারা এই রুটেই এ রাজ্যে নিয়ে এসে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। তারা কারা, তা জানার চেষ্টা করছে এনআইএ।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিহত হিন্দু সংহতি কর্মী

গত ২রা সেপ্টেম্বর, মুসলিম দুষ্কৃতিরা উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জের বামনগ্রামে গরুর রক্ত ফেলে যায়। বামনগ্রামে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাই প্রতিবাদ করতে আশেপাশের গ্রাম থেকে হিন্দুরা বামনগ্রামে এলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে মিটমাট করে উভয়কেই সরিয়ে দেয়। পাশের গ্রামে নিরাপদ বর্মণ বাড়ির ফেরার পথে মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তার পেটে ছুরি মারে। গুরুতর আহত নিরাপদকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন জায়গায় উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর মুসলানরা রাড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করলে হিন্দু সংহতির কর্মীরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই সময় মুসলিমদের ছোঁড়া বোমায় হিন্দু সংহতি কর্মী টোটান দাস মারাত্মক রকমের জখম হয়। রায়গঞ্জ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসার সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে, দিয়ে বিকাল ৪টা নাগাদ টোটন মারা যায়।

টোটনের মৃত্যুতে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি আগামী পাঁচ বছর টোটনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সংহতির সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য টোটনের বাড়ি গিয়ে তার শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে আসেন।

হাওড়ার জয়পুরে মুসলমানদের তান্ডব

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার রাতে হাওড়ার জয়পুর থানার খালনা অঞ্চলের ইওপ গ্রামে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে সিরাজ আলি, মমতাজুল সহ আরও দুজন মুসলিম যুবক মদ খাচ্ছিল। এমন সময় গ্রামের সনৎ ঘোষ তার ম্যাজিক গাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন। তার গাড়ির হেডলাইটের আলো যুবকদের মুখে পড়লে তারা সনৎ ঘোষকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। তিনি তার প্রতিবাদ করলে সিরাজরা তাকে মারধোর করে ও তার গাড়ির কাঁচ ভাঙচুর করে। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মুসলমান যুবকেরা ফোন করে মুসলমান পাড়ায় জানায় যে হিন্দুরা তাদের আক্রমণ করেছে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমানরা লাঠি, রড, সোড নিয়ে হিন্দু পাড়া আক্রমণ করে মারধোর ও ভাঙচুর চালায়। তাদের আক্রমণে ২০ জন আহত হয়। তাদের বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। দুইজন মহিলাও আহত হয়। সুনীল ঘোষের বাড়ির জানলা-দরজা ভাঙা হয়। তাঁর বৌমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ও নাতনিকে তুলে আছাড় মারতে যায়। আলম চাঁদ আলির নেতৃত্বে এই আক্রমণ হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির ছেলেরা এবং পুলিশ এলে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ পরে ২ জন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে।

গুয়াহাটি স্টেশনে শিলচরগামী যাত্রীবাহী ট্রেনে ১০ কেজি ওজনের আইইডি উদ্ধার

বড় ধরণের নাশকতার হাত থেকে রক্ষা পেল গুয়াহাটি স্টেশন। গত ১৮ই আগষ্ট, শুক্রবার প্রায় ১০ কেজি ওজনের আইইডি উদ্ধারে কোনরকমে নাশকতার সম্ভাবনা এড়ানো গেছে। পার্সেলের মোড়কে এই আইইডি শিলচর পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই আইইডি রেল মেল সার্ভিসে বুক করা হয়েছিল। গুয়াহাটি রেল স্টেশনের একনম্বর প্লাটফর্মের পেছনে মেল রুল থেকে শুক্রবার ১৮ই আগস্ট একটি পার্সেল-এর ভেতর থেকে টিক টিক শব্দ শুনতে পান হোমগার্ড নীরেন কলিতা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রেল পুলিশকে খবর দেন। পরে গুয়াহাটি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ও পানবাজার থানার পুলিশ বম্ব স্কোয়াড নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পার্সেল নিয়ে যায় শহরতলির রানী এলাকায়। পরে এটিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686